একক ৮ □ বাংলাসাহিত্য ঃ চৈতন্যোত্তর পর্ব

গঠন

৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ বৈষ্ণবপদাবলি
৮.৩ বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন
৮.৪ চরিতকাব্য
৮.৫ মনসামঙ্গল কাব্য
৮.৬ ধর্মমঙ্গল
৮.৭ অন্নদামঙ্গল
৮.৮ কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
৮.৯ শিবায়ন
৮.১০ অনুবাদকাব্য
৮.১০.১ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ
৮.১০.২ রামানন্দ ঘোষের রামায়ন
৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত
৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত
৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত
৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভাগবত
৮.১০.৭ দীন বলরাম দাসের ভাগবত
৮.১০.৮ দ্বিজ রমানাথের ভাগবত
৮.১১ শাক্তপদাবলি
৮.১২ নাথসাহিত্য
৮.১৩ মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা
৮.১৪ চট্টগ্রাম রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়বাক্য
৮.১৫ অনুশীলনী
৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ প্রস্তাবনা

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে এপর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলি, চরিতকাব্য, অনুবাদ কাব্য প্রভৃতি পুরানো ধারাগুলি যেমন এ পর্বে বজায় রয়েছে, তেমনি নতুন কয়েকটি ধারারও আবির্ভাব ঘটলো। যেমন শাক্ত পদাবলি, নাথ সাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা এবং চট্টগ্রাম-রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের ধারা।

৮.২ বৈষ্ণব পদাবলি

★ রাধামোহন ঠাকুর

বিশ্বপতি চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালেই রাধামোহন ঠাকুরেরও আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাধামোহন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে পরকিয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। "পদামৃতসমুদ্র" তাঁর বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থ। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাধামোহনের বেশিরভাগ পদই উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গোবিন্দ দাস যে সমস্ত ভাব নিয়ে পদ রচনা করেননি, ইনি সেইগুলি নিয়েই পদ রচনা করেছেন এবং এইভাবে কীর্তন গানের চৌষট্টি রসকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাধামোহন তাঁর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের 'মহাভাবানুসারিনী' নামে টীকাও রচনা করেছেন।

রাধামেহান ঠাকুর সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে শব্দের হিল্লোলিত বিলাস রয়েছে—

"মরকত মঞ্জুল কান্তি যশোহর/মানিনি-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর/ মোহন পিত পট
শোহ।।/মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।।/মাধবি-মল্লি-
মুকুলবর-মাধরীৎমালতি-মিলু ধাম ধাম।।"

এই শব্দবিলাস গোবিন্দ দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্বরাগের দশ অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায় নিয়েই রাধামোহন পদরচনা করেছেন, একটি পদে রাধা পূর্বরাগের দশমী অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁচেছেন। সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থা জানিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ রাধার কাছে আসেননি। সখী একা ফিরে এলে রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ যদি রাধাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে—

"তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়াসি/কিয়ে পুন কয়লি অকাজ।" এরপর মৃত্যু দশার দ্বারপ্রান্তে উপনীতা রাধা সখীকে সম্ভেবাধন করে বলেন—

"ইহ বন্দাবনে দেহ উপেখব/মৃতু তনু রাখবি হামার।/কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পায়র/তবহুঁ মনোরথ পূর।।"

সখীর কাছ থেকে রাধার এই অবস্থার কথা জেনে কৃষ্ণ রাধার অভিসারে চললেন। কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনায় রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণের যে ভাবরূপ অঙ্কন করেছেন, তা চৈতন্যদেবেরই মূর্তি। "চলতেই খলই চলই শাহি পারই/কত কত ভাব বিথারি।" বাসক সজ্জিকা রাধার সঙ্গে মিলনের শেষ কৃষ্ণ রাধার বেশবাসও বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, এছাড়া কবি ধীরা মধ্যাখণ্ডিতা এ অধীরা মধ্যাখণ্ডিতা রাধাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত নানা পর্যায়, যেমন মানান্তে মিলন, সঙ্কীর্ণ সম্ভেভাগ, মান প্রকারান্তর অকারণমান, শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য প্রভৃতি পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। রসালসের পদে উভয়ের সদ্যবিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—"একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন/অতয়ে সে মানয়ে দুখ।।" শ্রীরাধার হিমকালের অভিসারও এই কবির পদে রয়েছে। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের গৌরী আরাধনা ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনপ্রসঙ্গ পদাবলি সাহিত্যের একটি পরিচিত কথাবলম্বন। রাধামোহন তা নিয়েও পদ রচনা করেছেন। মিলন পর্যায়ের একটি পদে কবি কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ভাবের আন্তরিকতায় অতুলনীয়। "নূপূর কলরব

শুনইতে মাধব/কুঞ্জকে হোই বাহার।/চলইতে খলই বলই সব আভরণ/অম্বর হত সম্ভার।।" প্রকৃতপক্ষে রাধামোহন রাধাকৃষ্ণলীলার বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়গুলি নিয়ে সাত্ত্বিকভাবেই পদ রচনা করে গেছেন। কথাবস্তু বা ভাববস্তুর দিক দিয়ে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তাঁর পদে লক্ষ করা যায় না। গ্রীষ্মকালে রাধাকৃষ্ণের সরোবর মন্দিরে মিলনের প্রসঙ্গও কবি বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে, কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে যাচ্ছেন, তখন রাধা তার রথের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেইসময় রাধার অবস্থা বর্ণনা করে বৃন্দা বলেছেন, শ্রীরাধা কখনও বা বিলাপ করতে করতে রথের সামনে লুটিয়ে পড়ছেন, কখনও বা সজল চোখে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, কখনও বা দন্তে তৃণধারণ করে বলরামের সামনে আছড়ে পড়ছেন। হায়, এ দেখে কার না অত্যন্ত দুঃখ হয়।

রাধামোহন এই প্রসঙ্গ নিয়েই রাধার ভবন বিরহের পদ রচনা করেছেন—"খেনে খেনে কান্তি লুঠই রাই রথ আগে/খেনে খেনে হরি মুক চাহ।/খেনে খেণে মনহি করত জানি ঐছন/কানু সঞে জীবন যাহ। ***** খেণে তৃণ মুখে ধরি রথক আগুসরি/আছড়ি পড়ল নজ অঙ্গে।" পদের প্রথম চরণে কবি মূলকে অনুসরণ করে, পরের চরণেই বলেছেন, রাধা ক্ষণে ক্ষণে এমন মনে করেছেন যে, কৃষ্ণ চলে যাওয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণও বুঝি চলে যাবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের বিরহে রাধা মৃত্যু মুখে উপনীত হয়েছেন। এই অংশ পদকর্তার নিজের মৌলিক সংযোজন, এটি খুব সঙ্গতভাবেই পদের মধ্যে এসেছে। রাধা ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন, আবার বিরহের তরঙ্গে ডুবে যাচ্ছেন। সমস্তই কবির নিজস্ব কল্পনা, পদের শেষে কৃষ্ণের মথুরা গমনের সময় শ্রীরাধার অচৈতন্য হয়ে পড়া এবং অক্রুরের রথ নিয়ে প্রস্থান রামমোহনের নিজস্ব কল্পনা। শুধু তাই নয়, কবির কল্পনা আরও অগ্রসর হয়ে অপর একটি পদে রাধার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনাও দিয়েছে।

শ্রীরূপের "হংসদূত" কাব্যের প্রভাবেও রাধামোহন ঠাকুর কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের কাব্যে ললিতা হংসকে সহৃদয় বলে সম্বোধন করে নিজের বিরহদুঃখের বিষয় জানিয়েছেন। এই কবির পদে সেই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে—'সজনি অদভূত প্রেমক রীত/তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত/কহতাহি কত বিপরীত।।/তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল/পরম-হংস দয়াশীল।" কিন্তু শুধু নিজেদের দুঃখের কথা নয়, মথুরায় গিয়ে হংসকে তো আগে কৃষ্ণকে চিনতে হবে। তাই শ্রীরূপের 'হংসদূত'-এ ললিতা হংসের কাছে কৃষ্ণের পরিচয়ও বিস্তৃত ভাবে দিয়েছেন। রাধামোহনও এইভাবের একটি পদ রচনা করেছেন—"যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ/যো অবধারবি যদুকুল চন্দ।।/শুন তভূ কহি কিছু নিরুপম রূপ।/জগজনলোচন-অমিয়া স্বরূপ।/লাবণি-লহরি ললিত সব অঙ্গ।/ভ্রু বধূ-নটন মদন ধনু-ভঙ্গ॥"

এখানে কবি শ্রীরূপের পদের অনুসরণেই কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীরূপের 'হংসদূত' বর্ণিত ঘটনার পরেও রাধামোহন নিজের কল্পনায় পরবর্তী ঘটনা ভেবে নিয়ে তাকে বিষয় বস্তু করে পদ রচনা করেছেন। অবশ্য এটি তাঁর মৌলিক কল্পনা নয়, এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরী গোবিন্দ দাসের দ্বারা প্রভাবিত। রাধামোহনের পদে রয়েছে, ললিতার কথা শুনে হংস উড়ে চলে গেলে, যেখানে রাধা কিশলয় সজ্জায় শয়ন করে আছন, ললিতা সেখানেই ফিরে গেলেন, চতুর্দিকে সখিরা সবাই রাধাকে ঘিরে ধরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন—"হেরি ললিতা সবুহুঁ পরবোধই/কহতাহিঁ মৃদু মৃদু ভাষ॥/এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠায়লুঁ/মধুপুব কানুক পাশ/এত শুনি বিরহিনি চেতন পাওল/হোয়ল জিবনক আশ।" এখানে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য সখীদের তুলনায় ললিতা অনেক বেশি পরিমাণে চিত্তস্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, শ্রীরূপের বর্ণনায় ললিতার চরিত্রের এই দিকটির উল্লেখ নেই। এটিও কবি নিজেই কল্পনা করে নিয়েছেন এবং এটি অত্যন্ত সঙ্গত কল্পনা। কারণ, সখীদের মধ্যে একমাত্র ললিতাই তাঁর দুঃখের কথা হংসের কাছে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। ফলে তার বেদনার ভারও অনেকখানি কম হয়েছে। সেই কারণেই তিনি স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। রাধামোহন সখীর মুখ দিয়ে শ্রীরাধার বারো মাসের বিরহ বেদনা বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলিকারেরা কল্পনা করেছেন যে, বিরহিনী রাধাকে দেখার জন্য কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এসেছিলেন। রাধামোহন সেই ঘটনাকে গ্রহণ করে একটি পদে কৃষ্ণের মথুরা থেকে ব্রজে আগমন ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা নিয়েও কবি কিছু পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের বিদগ্ধ মাধবের কোন কোন শ্লোক অনুসরণেও রাধামোহন পদ রচনা করেছেন।

এই কবি দানলীলার ঘটনাকে অবলম্বন করেও পদ রচনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রেও তিনি অনুসরণ করেছেন শ্রীরূপের দানকেলিকৌমুদী নামক ভণিকাটিকে। শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদীতে শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের কথা বলেছেন। এর অর্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে রাধার মনে একই সঙ্গে গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ—এই সাতটি ভাব প্রকাশ পেয়েছে। রাধামোহন ঠাকুর শুধু এই ভাবের দ্বারাই নয়, 'কিলকিঞ্চিত' শব্দের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন—"গরবরি সুন্দরী চললহ আনত/শগর পন্থ আগোর/কহতহিঁ বাত দান তেহ মঝু হাত/আন ছলে কাঁচলি তোড়।।/অপরূপ প্রেমতরঙ্গ/দান-কেলি-রস কলিত মহোৎসব/বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ।।/অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল/তহিঁ জলবাণ পরকাশ।/ধুশইত ভুরু ধনু পুলকে নুরল তনু/অলিখিত আনন্দ-হাস।।" শ্রীরূপ তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রবাস-বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহের দশ দশার কথা বলেছেন, যা পূর্বরাগের দশ দশার অনুরূপ, অর্থাৎ চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাজব বা কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। রাধামোহন বিরহের বেশ কিছু পর্যায় নিয়েও পদ রচনা করেছেন। তাই বলা যায়, এই কবির কৃষ্ণকথায়ও গোস্বামীদের অনুসরণ ও শব্দবিলাস ছাড়া আর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই।

● চন্দ্রশেখর

অষ্টাদশ শতাব্দীর দুজন বিশিষ্ট পদকর্তা হলেন চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর। অনেকের মতে চন্দ্রশেখর ও শশীশেখর হলেন দুভাই এবং আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাঁদড় গ্রামের গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র। এরা 'নায়িকা রত্নমালা' নাম দিয়ে নায়িকার ৬৪ রকমের বৈশিষ্ট্যসহ ৬৪টি পদ সংকলন করেন। চন্দ্রশেখর বিভিন্ন রসপর্যায় নিয়ে পদ রচনা করেছেন। যেমন—অভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনায় কবি শ্রীরাধার দিবাভিসার, কুজ্ঝটি-অভিসার, চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসার প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসারের পদে অভিনবত্ব রয়েছে। এছাড়া বাসকসজ্জিকা রাধার বর্ণনায় কবি কিছুটা শ্রীরূপের অনুসারী। বাসকসজ্জিকা রাধার প্রতি সখীর উপদেশ চিত্তকর্ষক। তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ কাছে এলে রাধা যেন কপট নিদ্রার ভান করে পড়ে থাকেন। তাহলে—হম সব বোলব রাই ঘুমায়ল/আজি অনত যাহ চলিয়া। কিন্তু তাহলেও কৃষ্ণ যাবেন না। তিনি প্রদীপ নিয়ে নিদ্রিতা রাধার মুখ দেখতে বসলে, রাধা যেন দুটি পা প্রসারিত করেন, যাতে কৃষ্ণ যাবেন না। তিনি প্রদীপ নিয়ে নিদ্রিতা রাধার মুখ দেখতে বসলে, রাধা যেন দুটি পা প্রসারিত করেন, যাতে কৃষ্ণ তাঁর পদসেবা করবেন। সখীদের এই কথা শুনে বাসকসজ্জিকা রাধা—'বিহসি মুখ ঝাঁপল/অন্তরে উপজল লাজ' উৎকণ্ঠিতা রাধার বর্ণনায় কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর গীতাবলীর পদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিপ্রলব্ধা রাধার উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ ও অপমানবোধের জ্বারা ফুটে উঠেছে। রাধার বলার ভঙ্গীও এই কবির পদে অভিনব—'কুসুমিত শেজহিঁ ভেজহ আগুনি/অরু কিয়ে দেখহ চাই। মালতি-মাল সুবাসিত তাম্বুল/এদুঁহু দেহ জালাই।।' এর আগে কবিদের পদে বিপ্রলবব্ধা রাধার ক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশ পেলেও রাধা ফুলের বিছানায় আগুন লাগিয়ে দিতে বলেননি। কোকিলের রবে কৃষ্ণ সংকেত করলে রাধা তাঁর গৃহের অর্গল খুলে বাইরে আসতে চাইলেন, কিন্তু বলয়ের ঝঙ্কারে জরতী জেগে উঠে বলল—কো উহনিকসই/কহু কিয়ে বাহির ভেলি। তখন রাধা বাধ্য হয়ে হুঁ হুঁ করে নিজের মন্দিরে আবার প্রবেশ করলেন। রাধার বাড়ীর প্রাঙ্গণের কোনে একটি বদরী তরু অবস্থিত। কবি বলেছেন রাধার পরিবর্তে—রজনি পোহায়ল/হরি কোরে করি সোই গছে।

এখানে কবির স্মিত কৌতুক চমৎকারভাবে রূপ লাভ করেছে। এটি রবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত একটি পরিচিত পদের অনুবাদ। শ্লোকটির ভাব নিয়ে ইতিপূর্বে অন্যান্য বহু কবি পদ রচনা করেছেন। এই কবির পদে খণ্ডিতা রাধার কৃষ্ণের প্রতি তীব্র ব্যাঙ্গোক্তিও কবির শক্তিমত্তা প্রমাণ করে। রাধা বলেন—বন্দে বরজ-রাজ-কুল-নন্দন/বিজয় বারহ হরিজী। বন্দনা করার কারণ স্বরূপ রাধা বলেন—

কবুহুঁ নীলাম্বর কবহুঁ পিতাম্বর/কবহুঁ চন্দন চাঁদ ভালে। কবহুঁ সিন্দর সমূহ বিরাজই অজ্ঞান/অঞ্জন পুঞ্জ মিশালে॥

অপর একটি পদে অন্য নায়িকার কাছে থেকে প্রত্যাগত কৃষ্ণকে দেখে ক্রোধে রাধার স্বাভাবিক বাক্যস্ফূর্তিও ব্যাহত হয়েছে। খণ্ডিতা রাধার ক্রোধ প্রকাশের এই পদ্ধতি কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অতঃপর কলহান্তরিতা রাধাকে সান্তনা দিয়ে রাধার সখী কৃষ্ণের অন্বেষণে গোবর্ধন, যমুনাকানন প্রভৃতি খুঁজেও দেখতে পেলেন না। অবশেষে দেখলেন কৃষ্ণ নির্জন প্রান্তরের মাঝখানে পড়ে আছেন। এবং একটি স্বনবর্ণ পদ্ম হাতে নিয়ে—রাই রাই করি শিরে কর হানই/ধুলি ধূসর সব গায়। মানিনী রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কৃষ্ণের এই চিত্রটিও কবির মৌলিকতার নিদর্শন। এর আগে বিরহী কৃষ্ণের নানা মূর্তির সঙ্গে পরিচয় থাকলেও শূন্য প্রান্তরে রাধার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হেম পদ্ম হাতে হা-হুতাশারত কৃষ্ণকে আমরা এই প্রথম দেখলাম।

অপর একটি পদে কলহান্তরিতা রাধার সখী কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরিয়ে দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যান। কৃষ্ণ তাঁকে ডেকে করুণা করে তাঁর দিকে চাইতে বলেন। কিন্তু চতুরা সখী বলে, 'মাধব তুমি কি বলবে বল, আমি অন্য কাজে যাব, তোমার সঙ্গে কথা বললে সখীরা আমার দোষ দেবে।' কৃষ্ণ বলেন 'রাধা আমায় পরিত্যাগ করেছে, তুমিও যদি ত্যাগ কর, তবে আমি বিষ পান করব।' এর উত্তরে সখী তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে বলেন—আহিরিনি কুরুপিনি গুনহিনী ভাগি হিনি/তাহে লাগি কাহে বিষ পিয়বি/চন্দ্রাবলি -মুখ চন্দ্র-সুধা-রস/পিবি পিবি যুগ যুগ জিয়বি।

প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও এখানে উপস্থাপনায় নাটকীয়ত্ব, বাক্যবিন্যাসে তির্যকতা ও তীক্ষ্ণতা সঞ্চারিত হয়ে পুরাতন কৃষ্ণকথাকে নব রূপ দান করেছে। কৃষ্ণেরগ কাতরতা দেখে সখী ফিরে এসে রাধার কাছে কৃষ্ণের হয়ে করুণা ভিক্ষা করেছেন। ললিতা বলেছেন—আঁবর পাতি হম তুয় পাশে মাগিয়ে/মান-রতন দেহদান।।

মাথুরের পদগুলি গতানুগতিক। রঘুনাথের মক্তাচরিত্রে বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীরাধার অভিষেক পরবর্তীকালের বহু কবিকে পদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। চন্দ্রশেখরও রাইরাজার প্রসঙ্গ নিয়ে পদরচনা করেছেন। চন্দ্রশেখরের পদাবলির উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথায় কবি সূক্ষ্ম সামান্য কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন।

● শশিশেখর

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শশিশেখরও বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। এঁর গোষ্ঠবিহারের পদগুলি উল্লেখযোগ্য। এই গোষ্ঠবিহারের পদে কবি সুবল, অর্জুন, অংশুমান, দাম, বসুদাম প্রভৃতি ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণ সখাদের নাম করেছেন। এই পর্যায়ে মত্ত বলরামের যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন, তা উজ্জ্বল এবং জীবন্ত হলেও পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণনা থেকেই গৃহীত।

শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদে কবি ব্রজবুলির সঙ্গে সংস্কৃতেরও আভাস দিয়েছেন। পদটি সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্বরাগ সঞ্চারের পদ। রাধা নীপমূলে কৃষ্ণকে দেখে এসে সখীকে বলেছেন—নবহুঁ রুচি মেহ সখি নীপহুঁ মূলে পেখলুঁ/নয়ন মন ভলল মঝু ভরমং/তরুণ তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বরে/লখিতে নারিনু সখি গৌর কিয়ে শ্যামং।। জ্যোৎস্নাভিসারিকা ও তিমিরাভিসারিকা রাধার অভিসার বর্ণনা করেও কবি পদরচনা করেছেন। এর মধ্যে তিমিরাভিসারের পদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আজি অদভূত তিমরি রঙ্গ/আপনি না চিনি আপনঅঙ্গ/নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ/অংকুনা নাহি মানরি।

সমস্ত পদটিতে চিত্র রচনা, ধ্বনি ঝঙ্কার ও ছন্দ-হিল্লোল, অভিসারিকা রাধার আসন্ন মিলনের আনন্দ ও অভিসারের আবেগকে যেন উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। পদটির শিল্প সৌকর্য অতুলনীয়।

খণ্ডিতা রাধার কাছে অন্য নায়িকা উপভোগকারী কৃষ্ণের মিথ্যা কৈফিয়ৎও জয়দেবের সময় থেকেই চলে আসছে। এই কবির পদে, উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার এই অংশ নাটকীয় হয়ে উঠেছে। রাধা-কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন—নীল উৎপলের মত সুন্দর তাঁর মুখ ম্লান হল কি করে? কৃষ্ণ উত্তরে বলছেন, রাধার বিরহে রাত্রিজাগরণ করতে গিয়ে তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেছে। রাধা বলছেন, কৃষ্ণের কপালে সিঁদুরের দাগ এল কি করে? কৃষ্ণ বললেন গোবর্ধনে গৌরিক গেবি/সিন্দুর তখি লেল।। এইভাবে কৃষ্ণ বক্ষে নখ ক্ষতের ব্যাখ্যা দিলেন, রাধাকে খুঁজতে

গিয়ে কণ্টকে তাঁর বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। রাধা প্রশ্ন করলেন—নীলাম্বর কাহে পহিরিল/পিতাম্বর ছোড়ি। কৃষ্ণ বললেন বলরামের সঙ্গে বস্ত্র পরিবর্তিত হয়েছে। রাধা যখন প্রশ্ন করলেন—অঞ্জন কাহে খন্ত-স্থলে/খণ্ডন কাহে অধরে। তখন কিন্তু কৃষ্ণ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। অপর একটি পদও খণ্ডিতা মানিনী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে রচিত। এখানে কৃষ্ণের উক্তি সংস্কৃতে এবং রাধার উত্তর বাংলায়। কথাবস্তু ও ভাববস্তুতে নতুনত্বের সঞ্চার করতে না পেরে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা কেমন করে ভঙ্গি সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছিলেন, পদটি তারই প্রবল উদাহরণ। কৃষ্ণের বাজীকর ছদ্মবেশে কলহান্তরিত। রাধার কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়েও এই কবি পদরচনা করেছেন। এছাড়া অহেতুক মান, মুরলী শিক্ষা ও মাথুর বিরহকে বিষয়বস্তু করেও কবি কয়েকটি পদ রচনা করেছেন।

৮.৩ বৈষ্ণবপদ সংকলন

আলোচ্য কালপর্বে প্রস্তুত বেশ কয়েকটি বৈষ্ণবপদ সংকলন পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির গুরুত্ব কম নয়। এ সমস্ত পদ সংকলনের সুবাদেই প্রাচীন বহু পদ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। পদ সংকলনগুলিতে সংলকদের মর্জিত মেজাজের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। এখন পদ সংকলনগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।

● ক্ষণদাগীত চিন্তামণি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্তত সাতখানি পদ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হচ্ছে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত ক্ষণদাগীত চিন্তামণি। রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে চক্রবর্তী মহোদয় ৪৫ জন কবির লিখিত ৩০৯টি মাত্র পদ এই গ্রন্থে স্থান দেন। তার মধ্যে ৫১টি পদ তাঁর নিজের রচনা। তিনি আরও পদ হয়তো সংকলন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কেননা প্রত্যেক ক্ষণদার নীচে "শ্রীগীত চিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে" লেখা দেখে মনে হয় যে তিনি গ্রন্থের একটি উত্তর বিভাগও সংকলন করবার সংকল্প করে ছিলেন। কিন্তু হয়তো দেহান্ত হওয়ার জন্য আর তা পারেননি। তিনি ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভগবতের টীকা শেষ করেন। সম্ভবত এর কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষণদাগীত চিন্তামণি সংকলিত হয়। এতে ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলির ধারা দেখানোর কোন চেষ্টাই নেই।

● গীতচন্দ্রোদয়

পদামৃত সমুদ্রের পরই উল্লেখ করা যায় গীতচন্দ্রোদয়ের নাম। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্তী (আঁর এক নাম ঘনশ্যাম) গীত চন্দ্রোদয় নাম একটি বিশাল পদ সংকলন নামে একটি গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। ঐ গ্রন্থের মাত্র পূর্বরাগ সম্বন্ধীয় ১১৬৯টি পদ হরিদাস দাস প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যে ক্ষণদাগী চিন্তামণির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন—"সামান্যতর প্রথমেতে গাব গৌর গীত।/চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত।।"

গীত চন্দ্রোদয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় "আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ চন্দ্র করতলে বদন সঘন অবলম্ব' ইত্যাদি পদটির ভণিতায়. দেখি—'পুলক মুকুল ভরু সব দেহ/রাধামোহন কছু না পাওল সেহ।"

এই রাধামোহন রাধামোহন গোস্বামী। এই পদটি পদকল্পতরুতে ৬৮ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হয়েছে। সুতরাং গীতচন্দ্রোদয় সংকলনের সময় রাধামোহন ঠাকুরের কবি খ্যাতি প্রচারিত হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তী গীত চন্দ্রোদয়ে লিখেছিলেন—'মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা কিঞ্চিৎ ঘুচাইয়া।/অভিসারিকাদি অষ্ট গাব বিস্তারিয়া।/প্রথমে মুগ্ধাদি নায়িকাভেদ গীত।/তারপর গাব রাগানুরাগা কিঞ্চি/ইহার পরেতে গীতে হইব প্রকাশ।/পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস।।

পূর্বরাগেই ১১৬৯টি পদ আছে, সুতরাং তাঁর সংকল্পিত গ্রন্থে পাঁচ হাজারের কাছাকাছি পদ থাকবে এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পূর্বরাগ ছাড়া আর কোন অংশ এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

● **গৌরচরিত চিন্তামণি**

এটি নরহরি ঘনশ্যাম রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টাকালীয় লীলা গ্রন্থ, এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাতকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিবিধ লীলা বর্ণিত। এই গ্রন্থটির পদে উদাহরণ ঃ—দুগ্ধ সায়র মধ্যচারু সুমেরুশৃঙ্গ-সামন গৌর কিশোর দেহ সুলেহমণ্ডিত চন্তকর-মদভঞ্জনা। শ্রীগদাধর ধীর পরম উলস অন্তর তরল পুলকিত হেরি অনিমিখ অক্ষি রঞ্জিত লক্ষ স্মরকৃতগঞ্জনা।। এই গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েকটি ছন্দ উল্লেখ করা যেতে পারে—ললিত, শ্যামা, তারা, কুমারী, কান্তা, পার্বতী, সাবিত্রী, রজনী, রঙ্গমালা, দ্বিপদী, ত্বরিতগতি, মধুমতী, সুরঙ্গ, মোদক, মুক্তা কেশরী ইত্যাদি।

● **পদামৃতসমুদ্র**

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্র গ্রন্থটির সঙ্কলনের সঙ্গে "মহাভাবানুসারিনী" টীকাও সংযোজক করেছেন। পদামৃত সমুদ্রে পার ৭৬০টি পদ আছে। তাতে ২২৮টি পদ স্বরচিত বলে জানা যায়। রাধামোহন তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন, কথিত আছে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ নিয়ে যখন তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন রাধামোহন ছয়মাস ধরে প্রতিবাদ করে পরকীয়া বাদ স্থাপক করেন এবং সকল পণ্ডিত সমাজের দস্তখত যুক্ত এক জয়পত্র মুর্শিদাকুলি খাঁর দরবারে ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন রেজিস্ট্রি করা হয়। তিনি মালীহাটিতে থাকতেন এবং মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন।

রাধামোহন ব্রজভাষা, হিন্দি, মৈথিলী ও বাংলা গানের সংস্কৃত ভাষায় টীকা রচনা করে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করেন। যদিও আগেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চৈতন্য চরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা লিখেছিলেন। কিন্তু তা দুষ্প্রাপ্য এবং অসম্পূর্ণ। তিনি যে মহাসঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তা তান, লয়, বয়স, ভাব, ছন্দ, অলংকার এবং প্রসাদগুণ গুঙ্কিত তদীয় গীতাবলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

● **পদকল্পতরু**

বৈষ্ণব সমাজে পদামৃত সমুদ্রের পরই গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ 'পদকল্পতরুর' স্থান। বৈষ্ণবদাস নিজে একজন ভাল কীর্তন গায়ক ছিলেন। তিনি যে অনেক স্থানে ভ্রমণ করে ভাল ভাল পদ সংগ্রহ করেছিলেন সে কথা নিজের সঙ্কলনের শেষে বলেছেন—

আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধা মোহন/ কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।/গ্রন্থ কৈল পদামৃত-সমদ্র আখ্যান।/জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।/নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।/তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া।/ সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে হইা কৈল।/প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।।

তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে ৩১০১টি পদ সংগ্রহ করেছিলেন বলে বহু কবির কীর্তি রক্ষা পেয়েছে। এক একটি লীলার ওপর তিনি যতগুলি ভাল পদ পেয়েছেন তা দিয়েছেন। পদগুলি ঐতিহাসিক কালানুযায়ী সাজাবার তিনি কোন প্রয়াস করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর কলহান্তরিতা পদগুলি নেওয়া যায়। তিনটি পল্লবে তিনি যথাক্রমে ১৯, ১২ ও ১৩টি মোট ৪৪টি পদ সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে কীর্তনীয়া নিজের রুচি ও শ্রোতাদের অভিপ্রায় অনুসারে যে কোন ৮/১০টি পদ গাইতে পারেন। প্রথমেই রাধামোহন ঠাকুর কৃত গৌরচন্দ্রিকা, তারপর গোবিন্দ দাসে কয়েকটি পদ, পরে বিদ্যাপতির পদ, জ্ঞানদাসের পদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কীর্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাসের পদ এবং তারপর ষোড়শ শতাব্দীর জ্ঞানদাস এবং দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের পদ স্থান পেয়েছে। ৬০০ বছরের মধ্যে ভাব, ভাষা ও সাহিত্যরীতির যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তার প্রতি কোনোরূপ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন বৈষ্ণবদাস এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো সঙ্কলনকারীই মনে করেননি। ধর্মের বা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখানো তাঁদের কাজ ছিল না। তাঁর রসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য পালা সাজিয়ে ছিলেন। পদকল্পতরুতে ও যে কবির রচনা সর্বপেক্ষা বেশি স্থান অধিকার

করে আছে তিনি হচ্ছেন গোবিন্দ দাস কবিরাজ। গোবিন্দদাসের ৪৬০টি পদ, জ্ঞানদাসের ১৮৫টি ও রাধামোহন ঠাকুরের ১৮২টি পদ এতে স্থান পেয়েছে।

৮.৪ চরিতকাব্য

● **অকিঞ্চন দাস**

অকিঞ্চন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকের পদ্যানুবাদ করেন।

● **প্রেমদাস**

প্রেমদাস গঙ্গাদাস মিশ্রের পুত্র। তিনি ১৬৩৪ সালে কবিকর্ণসুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বাংলায় পদ্যানুবাদ করেন ও 'বংশী শিক্ষা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। বালুঘোষের মত গৌরলীলা বর্ণনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'বংশী শিক্ষা' গ্রন্থে শ্রীপাট বাখ্‌নাপাড়ার ইতিবৃত্ত কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

● **নরহরি চক্রবর্তী**

নরহরি চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা রেঙাপুর গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য জগন্নাথ। তাঁর রচিত গ্রন্থ—(১) ভক্তি রত্নাকর, (২) নরোত্তমবিলাস, (৩) শ্রীনিবাসচরিত্র, (৪) গীতচন্দ্রোদয়, (৫) ছন্দ—সমুদ্র, (৬) গৌরচরিত চিন্তামণি, (৭) নামামৃত সমুদ্র, (৮) পদ্ধতি প্রদীপ, (৯) সঙ্গীত কার সংগ্রহ প্রভৃতি। ইনি একধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতভক্ত এবং পরম ভক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে সকল ভক্তের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়নি। শ্রীলোকনাথ, শ্রী প্রবোধানন্দ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম প্রভুর কথা কোথাও নেই। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় আচার্যদের এবং তৎকালীন ভক্তবৃন্দের অপ্রকাশিত পূর্ব জীবনবৃত্তান্ত ভক্তিরত্নকার, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছন। ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডলের এবং দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ পরিক্রমার যে সুবৃহৎ ও পরিচ্ছন্ন মানচিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে স্থান বিলুপ্ত হলেও সহৃদয় ভক্তচিত্তে ও কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিকতত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিক বিচারে গ্রন্থটির মূল্য অত্যল্প হলেও স্থানাসূচক বিবরণে গ্রন্থটি অমূল্য।

৮.৫ মনসামঙ্গল কাব্য

● **কবি তন্ত্রবিভূতি**

কবি তন্ত্রবিভূতির আসল নাম বিভূতি। তিনি তান্ত্রিক ছিলেন বলেই তন্ত্রবিভূতি নামে পরিচয় লাভ করেন। ইনি উত্তরবঙ্গের কবি। তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের নাম 'মনসা-পুরাণ'। কিন্তু কবির নামেই অর্থাৎ তন্ত্রবিভূতি নামেই কাব্যটি বেশি পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

মঙ্গলকাব্যের কবিদের রীতি অনুযায়ী দেববন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু হয়েছে। মনসার আবাহন, ধর্মদেবতার স্মরণও বন্দনা। মনসার বন্দনা ও বাহনসহ দেবদেবীদের বন্দনায় কবি কাব্যকুশলতার পরিচয় রেখেছেন—

তোতালা সর্বেশ্বরী নমো দেবী বিষহরি—
বালকের যদি কর দয়া।

নাট নাটেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী

তুয়া গতি পদে দেহ ছায়া।।

চতুর্ভুজ মূর্তি সুন্দরী মনসার অষ্টনাগসজ্জায় অষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনায় পদ্মার প্রচণ্ড মনোহর রূপ উদ্ভাসিত— "চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর।/নানা আভরণ সর্প অঙ্গের উপর।।/... সিন্দুরয়িা নাগ দেবীর সিন্দূর উজল।/পুঞাচিঞা নাগ দেবীর নঞানে কাজল।/....দশনিঞা নাগ দেবীর দশন হইল।/দন্তমধ্যে ভ্রমর যেন গুজরিতে নাগিল"।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী দেবীর স্বপ্নাদেশে তন্ত্রবিভূতি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যে ক্ষীরোদ সাগরের উদ্ভব বর্ণনা পুরাণকে অনুসরণ করলেও কবির নিজস্বতার পরিচয়ও এখানে আছে। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহে দেবতাদের উপহার ও বিবাহে নানা উপঢৌকন দানের বর্ণনায় সমকালীন সমাজের বিবাহ প্রথারই জীবন্ত ছবি পাওয়া যায়।

● **জগজ্জীবন ঘোষাল**

জগজ্জীবনের কাব্য ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। ৫. আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কবি জগজ্জীবন দিনাজপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি পিতার নাম রূপরায় চৌধুরী ও মা-বেরতী।

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্য ও অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যের মত দেবখণ্ড ও বাণিয়াখণ্ড এই দু'ভাগে বিভক্ত। কবি বানিয়া খণ্ডে তন্দ্রবিভূতিকেই বিশেষ করে অনুসরণ করেছেন। মতের দিক থেকে তিনি শাক্ত ছিলেন। তাঁর কাব্যে দেবখণ্ডের প্রথমে কবি ধর্মমঙ্গলের মতই সৃষ্টিপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যের কাহিনীতে কিছুটা বৈচত্র্য আছে।

কবির বানিয়াখণ্ডের চরিত্রে অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের থেকে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বেহুলার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য চাঁদের প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাব, পরে আবার ভক্তির আতিশয্য, সমকার স্নেহ ব্যাকুলতা প্রভৃতি বর্ণনা প্রায় গতানুগতিক। মানবমানবীর চরিত্র বর্ণনায় স্নিগ্ধ কোমলতা বজায় রেখেছেন, তাঁর কাব্যে ঘরোয়া সুর মন্দ হয়নি। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় জীবনচিত্র, পরিবেশ, সমাজের ভাষা, রীতিনীতির প্রভাব কাব্যটিতে স্পষ্ট। তাই কাব্যটির একটি আঞ্চলিক মূল আছে। তবে দেবদেবীর চরিত্র বর্ণনায় ক্ষেত্রে তিনি যেন রোখ করে গ্রাম্য পাশব ও অনাগরিক রুচির আশ্রয় নিয়েছেন।

জগজ্জীবনের কাব্যে অশ্লীল বর্ণনা থাকলেও রসে কৌশল প্রশংসার দাবি রাখে। কবি যে সংস্কৃত পুরাণ, অলংকার শাস্ত্র জানতেন তার প্রমাণ কাব্যের মধ্যেই আছে। ছন্দ, শব্দপ্রয়োগ এবং উপমাদি অলংকার প্রয়োগেও তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, বুদ্ধি ও মনন বিশেষবাবে প্রশংনীয়। পয়ার ত্রিপদী ও তিনি অক্লেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ভাষায় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক প্রভাব থাকলেও বাক্‌রীতি অনেক জায়গায় তৎসম শব্দের অনুকূল। বেহুলা সনকার বিলাপ এবং চাঁদের শুষ্ক কঠিন বেদনা প্রকাশের ভাষা যথোপযুক্ত হয়েছে। 'হারামখোর'-দের প্রসঙ্গে কবি দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ সুকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্যটি মুদ্রিত হওয়ায় এর মধ্যে অঞ্চল বিশেষের সমাজ জীবনের বাস্তবচিত্র এবং মনসাকাল্টের অভিনব পরিচয় লাভ করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

● **জীবন মৈত্র**

মনসামঙ্গল কাব্যধারার একজন অপ্রধান কবি জীবন মৈত্র। বাগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। তাঁর পিতার নাম অনন্ত, মা স্বর্ণমালা, কবিরা পাঁচ ভাই।

কবির উপাধি ছিল কবিভূষণ, কবি তাঁর কাব্যে কাব্য রচনা কালের নির্দেশ দিয়েছেন—

মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্নিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।

অর্থাৎ ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গল রচিত হয়। কাব্য মধ্যে কবি নিজেকে রানী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলে উল্লেখ করেছেন।

সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও লাজুক প্রকৃতির লোক হওয়ায় জীবন মৈত্র নিজের প্রচার করতে পারেননি। নাটোরের জমিদারের কাছ থেকে তিনি কোনো সম্মানে ভূষিত হননি।

কবির সংসার স্বচ্ছল ছিল না। এই অস্বচ্ছলতা ভুলিবার জন্য তিনি কল্পনার রাজ্যে বিতরণ করতেন, সংসার অনভিজ্ঞ বলে তিনি 'পাগ্‌লা জীবন' নামে পরিচিত ছিলেন।

জীবনের মনসামঙ্গল দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড দুভাগে বিভক্ত। দেবখণ্ডে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ গৌরচন্দ্রিকাসমূহ মনসার জন্ম, বিবাহ কাহিনী বর্ণিত। বণিকখণ্ডে আছে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা কাহিনী।

জীবন মৈত্রের ভণিতায় 'ঊষা হরণ' নামে একটি কাব্য পাওয়া গিয়েছে। অনুমিত হয় এই অংশটি তাঁর মনসামঙ্গলেরই বিচ্ছিন্ন অংশ।

অন্যান্য মনসামঙ্গলের সঙ্গে জীবনের মনসা মঙ্গলের কিছু পার্থক্য আছে। এখানে বেহুলার পিতা বাহো সদাগর, মা মেনকা, ভাই শঙ্খধর, এবং বেহুলার নাম বেললি, কাব্যটির দু'একটি উপকাহিনী অন্যান্য মনসা মঙ্গলের থেকে আলাদা যেমন—'কাজল রেখা'-র কাহিনী অনুসরণে বেললি মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় ভাই শঙ্খধরের সঙ্গে দেখা হয়। শঙ্খধর বেললিকে চিনতে না পেরে প্রণয় নিবেদন করল। বেললির পরিচয় জানার পর শঙ্খধর লজ্জিত হয় এবং তাকে গৃহে ফেরার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বেললি সে অনুরোধ উপেক্ষা করে দুর্গম কর্তব্য পথে এগিয়ে যায়।

সংস্কৃত পুরাণের অশ্লীল অংশ গ্রহণ করার ফলে জীবনের কাব্য আদিরসাত্মক। পাণ্ডিত্যের ভারে অনেক সময় রচনা শৈলী জটিল হয়ে গিয়েছে। কাব্যে সংস্কৃত উপমা অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। রচনা অনেক সময় লালিত্যবর্জিত। অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি পাণ্ডিত্যমুক্ত হয়ে সহজ সরল ভাবে ভাব প্রকাশ করেছেন।

অনেক অনাবশ্যক অবান্তর রচনা কাহিনীর গতিকে রুদ্ধ করে তুলেছে। কবি কাব্যটিতে প্রত্যক্ষ সংসারের প্রত্যেকটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই স্তূপীকৃত উপকরণের নিচ থেকে তাঁর কাব্যের মূল বক্তব্য সহজে স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনি।

৮.৬ ধর্মমঙ্গলকাব্য

● রামদাস আদক

সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি হলেন রামদাস আদক। ১৩১১ সালে সাহিত্য সংহিতায় (১০ম-১১শ সংখ্যা) মধুসূদন অধিকারীর লেখা 'অনাদিমঙ্গলের কবি' নামক প্রবন্ধে সর্ব প্রথম রামদাস আদকের পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর ১৩৪৫ সালে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ থেকে রামদাসের অনাদি মঙ্গল কাব্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই কবির কাব্যের আত্মপরিচয় অংশ গতানুগতিক। ভুরশুট পগণার রাজা ভারতচন্দ্রের পূর্ব পুরষ প্রতাপনারায়ণের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের কাছাকাছি হায়াৎপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। তাঁরা জাতিতে চাষী কৈবর্ত্ত। চাষবাসই তাঁদের বৃত্তি ছিল। অতি অল্পবয়সে কবির পিতাবিয়োগ হওয়ার কালে বাল্যকালে

তিনি লেখা পড়া শেখার বিশেষ সুযোগ পাননি। চৈতন্য সামন্ত নামক এক রাজকর্মচারী কবিকে বাকী খাজনার দায়ে আটকে রাখে—

"তিন দিন রামদাস ছিল বন্দিখানা।
শিশুমতি বড় দুঃখ পাইল যন্ত্রণা।

এরপর তিনি কোনমতে মুক্তিলাভ করে মামার বাড়ীর দিকে ত্রা করলেন পথে এক সিপাহির সঙ্গে দেখা। রামদাস মনেমনে ভাবলেন—

দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই
বিদেশে বেগারি বুঝি লইবে সিপাই

সিপাই রামদাসের মাথায় মোট চাপিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কবি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তৃষ্মার্ত কবি কামদীঘিতে জল খেতে গেলে দীঘির জল শুকিয়ে গেল। আর রামদাস দেখলেন—ঝারি হাতে ঘাটে এক নবীন ব্রাহ্মণ। তিনি আসলে ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম। তিনি রামদাসকে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করতে বললেন।

নানা প্রমাণ থেকে মনে হয় কবি ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে অনাদিমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

রামদাসের কবিত্ব শক্তি প্রশংসার যোগ্য। কাহিনীও চরিত্রসৃষ্টিতে সংহত রচনা কৌশল, পরিচ্ছন্ন প্রবাহ, ক্লাসিক গঠন এবং স্নিগ্ধ পদলালিত্য এর মধ্যে দুর্লভ নয়। এই ধরনের কিছু পদের উদাহরণ প্রমাণে দেওয়া যেতে পারে—

(১) চিনিতে রোশিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।
জগতে স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনো।।

(২) নলিনীদলের জল জীবনচঞ্চল।
জলেতে বিচম্বাক যেন বারে টলমল।।

(৩) যশকীর্তিহীন জীবন অকারণ।
যশ যার নাই তার জীবন্তে মরণ।।

তবে রামদাসের কাব্যের সঙ্গে রূপরামের কাব্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

● সীতারাম দাস

সীতারাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলকাব্যের আর একজন কবি। তাঁর কাব্যটি ১৬৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে রচিত হয়েছে। এই কবির আত্মজীবনী থেকেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবি সীতারামের জন্ম হয়। কবি জাতিতে রাঢ়ীয় কায়স্থ। কবির পিত্রালয় সুখসাগর গ্রামে। পিতার নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর আত্মকাহিনী সহজ ও সাবলীলভাবে বর্ণিত।

কবি কাব্যের শুরুতে ময়ূরভট্টের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁরই পদটি অনুসরণ করে তিনি কাব্য লিখেছেন, একথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন। এ পর্যন্ত তাঁরকাব্যের যতগুলি পুথি পাওয়া গেছে সবই খণ্ডিত। তাঁর রচনা বিবৃতিমূলক, পরিচ্ছন্ন এছাড়া অন্য কোনও অভিনবত্বের পরিচয় এখানে পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা হলেন যদুনাথ ও শ্রীশ্যাম পণ্ডিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তত দশজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এঁদের মধ্যে দুজন হলে বিশিষ্ট ঘনরাম ও মানিকরাম।

● ঘনরাম চক্রবর্তী

অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিশালী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত। ঘনরামের কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ছাপা হয়ে যাওয়ার পর জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার পায়।

ঘনরামের কাব্যের ভণিতা থেকে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কইমড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে, দামোদরের দক্ষিণতীরে বর্ধমান থেকে প্রায় চার ক্রোশ দক্ষিণে। তাঁর পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা। পিতামহ ধনঞ্জয়, মাতামহ রায়না-নিবাসী। হরি ঘনরামের চার পুত্রের নাম হল রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত অর্থাৎ বৃত্তিভোগী ছিলেন। এছাড়াও ঘনরামের ভণিতা থেকে জানা যায় ঘনরামের গুরুর নাম ছিল শ্রীরামদাস। ঘনরামের কাব্য ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দের শেষে সমাপ্ত হয় বলে মনে করা হয়।

নানা পুরাণ উপপুরাণ ও কাব্যকাহিনী থেকে গল্প উপমা ইত্যাদি সংগ্রহ করে ঘনরাম তাঁর কাব্যকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিয়েছেন। এটি ২৪টি পালায় বিভক্ত—

(১) স্থাপনা পালা (দেবদেবী বন্দনা, অম্ভুবুবতী অপ্সরীর তালভঙ্গ, ধর্মপূজা প্রচারে মর্ত্যধামে রঞ্জাবতীরূপে জন্ম) (২) ঢেকুর পালা (ইছাই ঘোষের কাহিনী, (৩) কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ, (৪) হরিশ্চন্দ্র পালায় হরিশচন্দ্র ও লুইসেনের কাহিনী, (৫) রঞ্জাবতীর শানে ভর দিয়ে ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্রবর লাভ, (৬) লাউসেনের জন্ম, (৭) অখড়া পালায় দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক লাউসেনকে পরীক্ষা, (৮) ফলা নির্মাণ পালায় দেবী প্রদত্ত অস্ত্রের দ্বারা ফলা নির্মাণ (৯) গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও কর্পূরের গৌড়যাত্রা (১০) কামদল পালা-এর বিষয়বস্তু হল লাউসেন কর্তৃক কামদল বাঘ বধ, (১১) জ্যামতি পালাতে আছে অসতী নারীদের কবল থেকে লাউসেনের আত্মরক্ষা, (১২) গোলাহাট পালায় সুরিক্ষার কবল থেকে লাউসেনের উদ্ধার, (১৩) হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক হস্তী বধ, (১৪) কাঙুর যাত্রা পালায় লাউসেনের কামরূপ যাত্রা, (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালায় লাউসেনের কামরূপ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে বিবাহ, (১৬) কানাড়া স্বয়ম্ভবর পালায় রাজা হরিপালের কন্যা কলড়ীর সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ, (১৭) কানাড়া বিবাহ পালায় লাউসেন কর্তৃক লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিতকরণ (১৮) মায়ামুণ্ড পালায় মহামহের কুটিল চক্রান্তে লাউসেন পত্নীদের বিভ্রান্ত করার কাহিনী। (১৯) ইছাই বধ পালায় লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ নির্ধন, (২০) আঘোর বাদল পালায় গৌড়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি, (২১) পশ্চিমে উদয় পালায় লাউসেন কর্তৃক পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানোর আয়োজন, (২২) মহাময় কর্তৃক লাউসেনের রাজধানী আক্রমণ করতে এসে যথাযোগ্য শাস্তি পেয়ে পলায়ন, (২৩) পশ্চিমে উদয় পালায় কঠোর সাধনার দ্বারা, লাউসেনের অসাধ্যসাধন (২৪) স্বর্গারোহন পালায় লাউসেনের স্বর্গারোহণ এবং মহামদের উচিত শাস্তি লাভ—এই খানেই সমাপ্ত হয়েছে।

এই মহাকাব্যে বিশালায়ন কাব্যে ধর্মের সেবিকা রঞ্জাবতী। তাঁর পুত্র ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেন। লাউসেনের বীরত্ব ব্যঞ্জক নানা কাহিনী এবং ধর্মের কৃপায় অসাধ্য সাধন প্রভৃতি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি থেকে নানা গল্প কাহিনী পুরাণের ছাঁটেই গ্রহণ করেছেন। ঘনরামের কাব্যে ধর্মের পূজা প্রচারের চেয়ে কৃচ্ছসাধন এবং লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্ব বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ঐতিহাসিক নামধামের সঙ্গে অল্প স্বল্প সাদৃশ্য রেখে এবং ধর্মমঙ্গলের পুরাতন ধারার অনুকরণ করে ঘনরাম এই কাব্যে সত্যই বীররসাত্মক

মহাকাব্যের বিশাল সৌধ রচনার চেষ্টা করেছেন। রঞ্জার বাৎসল্য, ব্যাকুলতা, লাউসেনের অদ্ভুত বাহুবল, মহামদের প্রচণ্ড বৈরিতা, গৌড়েশ্বরের দোলাচল মনোবৃত্তি, ধর্মের কৃপায় লাউসেনের অলৌকিক অনৈসর্গিক কৃতিত্ব প্রদর্শন—এ সমস্ত কাহিনীই কবি বেশ দীর্ঘ আকারেই বর্ণনা করেছেন। নারীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর শৌর্য বীর্যের প্রকাশ একমাত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। লাউসেনের চরিত্র পরীক্ষা অংশেও ঘনরামের কৃতিত্বের অবিসংবাদী পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরামের কাব্যে ঘটনা উপস্থাপনা ও বর্ণনার গুণে তাঁর চরিত্রবল ও নৈতিক শুদ্ধাচার বেশি প্রশংসা দাবি করতে পারে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে ঘটনা বর্ণনা, চরিত্র শ্রেষ্ঠ মহৎ আদর্শের রূপায়ণ এবং মঙ্গল কাব্যের অলৌকিক পরিবেশ। সৃজনেও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মৃদু হাস্যকৌতুক, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় তিনি সমসাময়িক অনেক কবির তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্য কাহিনী পয়ার ত্রিপদীর স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় প্রবাহিত হয়েছে। তিনি ভারতচন্দ্রের মত অলঙ্কারসৃষ্টি ও মণ্ডলকলানৈপুণ্য দেখাতে পারেননি, আবার মুকুন্দরামের মত প্রসন্ন জীবনচিত্রও তিনি ততটা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। শিরায়নের কবি রামেশ্বরের বাস্তব চিত্রণের কৃতিত্বও তিনি দাবি করতে পারেন না। কিন্তু তাহলেও ধর্মমঙ্গলের কবি হিসেবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারেন।

● মানিকরাম গাঙ্গুলি

মানিকরাম ধর্মমঙ্গলের পরিচিত কবি হলেও তাঁর কাব্যরচনার সাল তারিখ ইত্যাদি নিয়ে বাগম্বিতণ্ডা দেখা দিয়েছে। বাংলা ১৩১২ সালে হরপ্রসাদশস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ থেকে মানিক গাঙ্গুলির শ্রীধর্মমঙ্গল প্রথম মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন এইকাব্যরচনাকাল নির্ণয় করেছেন ১৪৬৯ শকাব্দ বা ১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ দত্ত এর কাল নির্ণয় করেছেন ১৮৮৭ অব্দ অর্থাৎ এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পদের কবি। এর অন্যতম প্রমাণ হল তার কাব্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন উল্লেখ আছে—

বিষ্ণুপুর বন্দির শ্রী মদনমোহনে।
পূর্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে॥

৮.৭ অন্নদামঙ্গল

● কবি ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা মঙ্গলকাব্যের গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যেও নতুনত্বের সৃষ্টি করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দশবছর ধরে পরিশ্রম করে অন্যান্য প্রাচীন কবিদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী সংকলিত করে তার সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় তার প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সম্পর্কে আরও নানা ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে।

ভারতচন্দ্র ১১০০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে হাওড়া হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে বা রাধানগর গ্রামে এক জমিদার পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে বিবাদে তাঁর পিতা নরেন্দ্ররায় হৃতস্বর্বস্ব য়ে পড়েন। ভারতচন্দ্র চোদ্দ বছর বয়সে সংস্কৃত টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন এবং মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তাজপুরের কাছাকাছি সারদা গ্রামের কেশরকুনি আচার্যদের একটি বালিকা কন্যার পানিগ্রহণ করেন। এরপর ভারতচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর কাছে ফার্সি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় একদিন রামচন্দ্র মুন্সির গৃহে সত্যনারায়ণ পাঁচালী পাঠ করেন। এইটিই তাঁর প্রথম রচনা। এতে তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছে—

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাতে হতকংশ, ভুরসুটে বসতি
নরেন্দ্ররায়ের সুত ভারতভারতীযুত
ফুলের মুখুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি।

১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র পারসীভাষা শিক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরে এলে তাঁর অগ্রজেরা সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে তদ্বির করার জন্য তাঁকে বর্ধমান রাজসরকারে পাঠান। কিন্তু বর্ধমান রাজ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে ভারতচন্দ্র কারাগার থেকে পালিয়ে যান এবং উড়িষ্যার কটকে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল এক নাপিত ভৃত্য, তার নাম রঘুনাথ। ১৭৪২ থেকে ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতে থাকেন। এই সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় তিনি হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর শালিকাপতির নিবাস ছিল। তিনি ভারতচন্দ্রকে চিনতে পেরে তাঁকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেন। এরপর ভারতচন্দ্র স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে কিছুদিন সেখানেই বাস করতে থাকেন। তারপর স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রেখে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তখন ফরাসডাঙায় প্রসিদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসী সরকারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ভারতচন্দ্র তাঁরই শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রনারায়ণ ভারতচন্দ্রের কবিত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে ১৯৫৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠালে তিনি ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। তাঁরই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি দিয়ে গঙ্গাতীরের মূলাজোড় গ্রামে তাঁকে সামান্য খাজনায় ইজারা দেন। কিন্তু রামদেব নাগ নামে এক ব্যক্তির অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। কৃষ্ণচন্দ্র এর অর্থ উপলব্ধি করে রামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করার ব্যবস্থা করেন। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের সময় অষ্টদশ শতাব্দী যুগসন্ধিক্ষণকে ধারণ করেছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর কাব্যে সেই নতুন যুগের রূপটি ধারণ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেশ থেকে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটেছে। মুসলমান আমলের সেই চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ-সভ্যতার পতনের শেষ ক্ষীয়মান দীপ্তি তৎকালীন সমাজের ওপর নিজের বিলীয়মান প্রভাবে অন্তিম প্রহর ঘোষণা করছে। অন্যদিকে ইংরেজ বণিকের অনুগ্রহ পুষ্ট হয়ে দেশে এক নতুন অভিজ্ঞতা ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে লাগল। সমাজে তখনও পুরাতন ধারার বেশ রয়েছে, কিন্তু ভাঙনের মুখে সমাজের শাসন নেই। চারদিকে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলা, প্রবৃত্তির অবারিত উন্মত্ততা রাজত্ব করছে। প্রবৃত্তির এই নিম্নাভিমুখী গতি ভারতচন্দ্রকেও গ্রাস করেছিল। তাই তাঁর মহৎ প্রতিভা তিনি উপযুক্ত সৃষ্টিতে নিয়োগ করতে পারেননি। তৎকালীন জনরুচির কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'অন্নদামঙ্গল' রচনার আগেই ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি পরিণত বয়সে ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন—

বেদলয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই তিন খণ্ড তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য। প্রথম খণ্ডের নাম 'অন্নদামঙ্গল বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গলা'। দ্বিতীয় খণ্ডে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কথা অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে প্রথমেই পঞ্চদেবতা ও লক্ষী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বন্দনা। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, সতীর দক্ষালয়ে গমনে উদ্যোগ, সতীর দক্ষালয় গমন, শিবানন্দয়ে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতির স্তবে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ, একান্নপীঠের বর্ণনা, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, নারদ কর্তৃক শিবের বিবাহসম্ভবন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতিবিলাপ রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি। এই অংশেই আছে কুবেরের পুত্র বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, অন্নদার শাপে বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার দয়া, হরিহোড়ের প্রতি বরদান, বসুন্ধরের জন্ম, কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরের প্রতি অন্নদার শাপ, মর্ত্যলোকে নলকুবেরের ভবানন্দ মজুমদার রূপে জন্ম। অন্নদার ভবানন্দভবন যাত্রা ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পৌরাণিক অংশ ও অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয় কাহিনীর লৌকিক অংশে পার্থক্য আছে, অন্নদামঙ্গলের লৌকিক অংশ কাব্যের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপ্রধান অংশমাত্র। এতে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর অহৈতুকী দয়া, তাঁকে বরদান ও পরে তাঁকে অন্যায় ভাবে পরিত্যাগ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুর্বপুরুষ ভবানন্দের ভবনে যাত্রা ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই লৌকিক কাহিনীটুকুর মধ্যে কাহিনী অথবা চরিত্র কোনোটিই সুপরিস্ফুট হয়নি।

পৌরাণিক অংশে কবি সংস্কৃত কাশীখণ্ড ও অন্যান্য শিবপুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ব্যাসপ্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে নেই। বুদ্ধিহত বৃদ্ধ ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার কাশীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে নতুন কাশী নির্মাণ করতে গিয়ে কি রকম নাকাল হয়েছিলেন কবি তারই বর্ণনা ব্যাপ্রসঙ্গে দিয়েছেন।

ভারতচন্দ্র নানা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তার এই বহুমুখী জ্ঞান অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নিয়োচিত করেছিলেন। তবুও এই কাব্য রচনায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুরাণের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। প্রথমত তিনি একান্নপীঠ বর্ণনায় 'মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে'র সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন,—

একমত না হয়ে পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্র মত।

ব্যাসের শিবানন্দার কাহিনী কবি গ্রহণ করেছেন স্কন্দপুরানের কাশীখণ্ড থেকে।

অন্নদামঙ্গলের চরিত্রগুলির মধ্যে স্বল্প পরিসর জুড়ে থাকলেও সবচেয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র। সাধারণ নিম্নবিত্ত বাঙালির প্রতিভূ হয়েই সে এই কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এখানে প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে,—

১। নগর পুড়িয়ে দেবালয় কি এড়ায়ে?

২। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া

৩। খুঞা তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাতে।

৪। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।

৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ইত্যাদি।

তাঁর ভাষার ঐশ্বর্যও অতুলনীয়, সংস্কৃত, পারসী ও প্রকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয়ে তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করেছেন, তা নয়—তাঁর অপূর্ব শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য দ্বারা তার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করেছেন। ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলাভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতামুক্ত হয়ে উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে যে রুচিদোষের জন্য সাধারণত ভারতচন্দ্রে নিন্দা শুনতে পাওয়া যায় 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম খণ্ডে তা নেই। কাব্য শরীর গঠনের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী—যিনি সচেতন ভাবে শিল্পরীতির অনুসরণ করেছেন। কাব্য রচনা রসের প্রাধান্যকে তিনি স্বীকার করেছেন। ভারতচন্দ্রের আগে তাঁর মত নির্দোষ অন্ত্যানুপ্রাস আর কেউ ব্যবহার করতে পারেননি। এ বিষয়েও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন শিল্পী। ভারতচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নানাবিধ ছন্দের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ছন্দ তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দকে তিনি নানাভাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতচন্দ্রকে ব্যঙ্গরসের কবিও বলা যায়। সামাজিক কুপ্রথার প্রতি বক্রোক্তি তাঁর হাস্যরসের মূল। দাসুবাসুর বর্ণনায় ও কোটালের ভীতিতে তদানীন্তন বাঙালির জাতীয় জীবনের কাপুরুষতার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কাব্যে ভক্তির জায়গা দখল করেছে ব্যঙ্গ আর অবিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত। মানসিংহের বাংলা আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষ্য করে কবি কৌশলে এটি মূলকাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এটির আর এক নাম 'কালিকামঙ্গল'। সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামে একটি শ্লোক সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী কবিদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বনে ভারতচন্দ্র এটি রচনা করেছেন। রাজকুমারী বিদ্যাও রাজকুমার সুন্দরের গোপন প্রেম, বিদ্যার পিতা মহারাজ বীরসিংহ কর্তৃক চোর ধরা। শিরছেদের জন্য মশানে নিয়ে যাওয়া। কালিকার প্রসাদে তাঁর অবলম্ভবন। তবে হীরামালিনী বিদ্যার মা, নগরপাল—কোটল ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রগুলি তাঁর কাব্যের এই অংশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসুন্দর সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র আদিরসকে অলঙ্কৃত শিল্পসূষমা দান করেছেন।

অন্নদামঙ্গলের শেষ অংশের নাম মানসিংহ কাব্য। এটি অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য বলেই অভিহিত করা যায়। এর রচনার সময় হল ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত হলেও 'মানসিংহ-কাব' কাব্যই, ইতিহাস নয়। তবে এই কাব্যে মানসিংহ ছাড়াও জাহাঙ্গীর, প্রতাপাদিত্য, ভবানন্দ প্রমুখ ঐতিচহাসিক চরিত্রেরও উপস্থিতি আছে। মানসিংহ কাব্য রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমাকীর্তন। নবদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করবার জন্যই মর্ত্যধামে তাঁর আগমন—এটিই মানসিংহ কাব্যের বিষয়বস্তু। তাই কাব্যটির নাম মানসিংহ না হয়ে ভবানন্দ হলে ঠিক হত। এই কাব্যের উপসংহার ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজবংশাবলী ও তার রাজাদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, তার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গালকাব্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচিত হলেও অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের সঙ্গে এর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—চণ্ডীমঙ্গালে পরস্পর সম্পৃক্ত দুটি কাহিনী অন্যদিকে এতে আছে পরস্পর স্বাধীন

তিনটি কাহিনী। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা দেবতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই ধরনের ভক্তিভাবের বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। ধর্মের গোঁড়ামি সবসময়ই পরিত্যাজ্য ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে শিবের মুখ দিয়ে ব্যাসের প্রসঙ্গে তা বলিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের ধর্মবোধের যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় আর কারো মধ্যে তা দেখা যায় না। এর কারণ সম্ভবত অন্যান্য কবি নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্মবোধের প্রেরণায় কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র অন্যের আদেশে পৃষ্ঠপোষকের পারিবারিক গৃহদেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

সমাজজীবন সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যাসুন্দরে কাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন যে কুলীনসর্বস্ব নাটক রচনা করেছিলেন, ভারতচন্দ্রের নারীগণের পতিনিন্দা থেকেই তিনি তার প্রেরণা পেয়েছিলেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়—

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তরে বড়দিদি হই।
* * * * *
দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার
সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারিতায়
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥

অসম বিবাহে দাম্পত্যজীবনে কি সুগভীর দুঃখের কারণ হয়, তা সমাজ সেদিন অনুভব করেনি। কারণ নারীমনের দুঃখ বেদনার অনুভূতি সেদিন অব্যক্ত ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র নারীমনের এই অব্যক্ত বেদনার অবরুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিলেন। অসমবিবাহই সে যুগের সমাজে নারীজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল। বিদুষী নারী তার কালা স্বামী সম্পর্কে বলেছে—

সাধ করে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হল হত॥

হাস্যরসের আড়ালে মধ্যযুগীয় কৌলীন্য প্রথার বীভৎসতাকে কবি এইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।"

ভারতচন্দ্রের নাগাষ্ঠক শিখারিণী ছন্দেরচিত। অন্যান্য কাব্যে ও তার ছন্দকুশলতার পরিচয় আছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে এক বাস্তব মানুষের ক্ষণিক আবির্ভাব সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই অমর হয়ে আছে। চরিত্রটি ঈশ্বরী পাটনীর। ঈশ্বরী পাটনী চিরকালের নিরন্ন বাঙালির প্রতিনিধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দরিদ্র বাঙালি মাঝি দেবীর পায়ের স্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়া সেঁউতির অলৌকিকতায় ভুলে যায়নি। সে তার দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিজের জীবনে আলো আর পাবে না জেনেই দেবীর কাছে বর চেয়েছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"।

নাগাষ্টক, সত্যনারায়ণের ব্রতকথা আরঅমর সৃষ্টি অন্নদামঙ্গল ছাড়াও ভারতচন্দ্র রচনা করেছেন রসমঞ্জরী। এটি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নায়িকা প্রকরণ অবলম্বনে লেখা।

এছাড়াও আছে ভারতচন্দ্রের লেখা টুকরো কবিতা। ঋতুবিষয়ক দুটি কবিতা হল বসন্ত বর্ণনা ও বর্ষার বর্ণনা। এর মধ্যে বর্ষা বর্ণনায় আছে কৃষ্ণনগর প্রসঙ্গ—

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা রাজঘরে দশভূজা
দেখিনু মৈনাকানুজা জগতের হর্ষা।

এছাড়া হাওয়া বর্ণনা, বাসনা বর্ণনা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি নামের টুকরো কবিতাও তাঁর রয়েছে। ভারতচন্দ্র মিশ্র ভাষায় চণ্ডীনাটক রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এটি শেষ হলে সাহিত্যরীতির অন্যন্য নিদর্শন হোতো। কিন্তু এর সামান্য সূচনা হয়েছিল মাত্র। এতে কবি সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা তিনটি ভাষা ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় মলিনী ছন্দে লেখা 'গঙ্গাষ্টক' ও ভারতচন্দ্রে কবিপ্রতিভার নিদর্শন।

৮.৮ বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল

● কৃষ্ণরাম দাস

কৃষ্ণরাম দাস ছিলেন নিমতার কবি। কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ছায়ায় তাঁর যশ অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ কে দিলে কৃষ্ণরাম দাসই বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখযোগ্য কবি।

কাব্যে কলি জ্ঞাপক হেঁয়ালি থেকে বোঝা যায়, ১৫৯৮ শক বা ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাব্য সমাপ্ত করেন। কাব্যের মধ্যে ঔরঙ্গজেব ও সুবাদার শায়েস্তা খাঁয়ের নাম আছে। কবি বলেছেন মাত্র ২০ বছর বয়স তিনি কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। কাব্যের সুচনায় পৌরাণিক আখ্যান থেকে থাকতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু যে পুথি পাওয়া গিয়েছে তাতে লৌকিক আখ্যানটুকু আছে। মনে হয় বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর জনপ্রিয়তার জন্য পুথি লেখকরা পৌরাণিক অংশ বাদ দিয়ে লৌকিক নায়ক-নায়িকার আখ্যানটি নকল করেছিলেন।

কাব্যের কাহিনী গতানুগতিক। দু-একটি জায়গায় ও চরিত্রে যৎসামান্য নতুনত্ব আছে। রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণরাম অশ্লীল শব্দ লিখতে সঙ্কোচবোধ করেননি। কলাবতী শম্নী ব্রাহ্মণীকে বিদ্যা যে ভাষায় লাঞ্ছিত করে সে ভাষায় অশ্লীল। দু একটি চরিত্র বর্ণনায় এবং পরিমিত ভাষা ব্যবহারের পরিণত কবিবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তার কাব্য প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, তিনি মাটির ঢেলা দিয়ে বিরাট ইমারত গড়তে গিয়েছিলেন। আর ভারতচন্দ্র তাই দিয়ে বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন। হতে পারে, অপরিণতি বয়সের রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যগুলিও দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা।

● রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর

রামপ্রসাদ কালিকামঙ্গলের মোড়কে আদিরস প্রধান বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যটিতে আদিরসের সঞ্চারের কারণ মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তক রামপ্রসাদকে প্রদত্ত জমির দলিল দেখে মনে হয় তাঁর বিদ্যাসুন্দর ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের পর রচিত হয়েছিল।

রামপ্রসাদ তাঁর বিদ্যাসুন্দরে কৃষ্ণরাম দাসকে অনুকরণ করেছিলেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র সমসাময়িক কবি হওয়ার এবং একই ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় সম্ভবত কেউ কাউকে বড় একটা অনুসরণ করেননি। ভক্তকবি

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কিছু উল্লেখযোগ্য। চরিত্র পরিকল্পনায় রামপ্রসাদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। যদিও ভারতচন্দ্রের মত কবিত্ব ও রচনাকৌশল তাঁর ছিল না। তাই সমাগুণ সত্ত্বেও কাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কাব্যটিতে দু একটি স্থানে অশ্লীল বর্ণনা আছে। এই অশ্লীলতা শিল্পের দ্বারা সংযত তিনি করেননি। কাব্যটিতে যত্রতত্র কালী সাধনার উল্লেখ করেছেন এবং বৈষ্ণবদের তীব্র নিন্দা করেছেন। যাই হোক, যুগধর্ম ও রাজপৃষ্ঠ পোষকতা রামপ্রসাদের এতটা প্রভাবিত করেছিল যে এই ভক্তকবি বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের কামকূপে ডুবতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করেননি।

● কবি শেখর বলরাম চক্রবর্তী

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী কে বিদ্যোৎসমাজের সামনে নিয়ে এসেছেন। কবি ভারতচন্দ্রের আগে ১৭শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে বিশুদ্ধ মঙ্গল কাব্যের ছাঁচে কলিকামঙ্গল রচনা করেছিলেন। কাব্যটির শেষাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়ার রচনাকাল জানা যায় না। তবে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। কারণ তিনি কাশীজোড়ার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণের (১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ ছিলেন। এঁর কাব্যে রাঢ়ের দেবদেবীর উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় কবি রাঢ়ের কবি। রচনা ও কাহিনী গ্রন্থনে অল্পস্বল্প নতুনত্ব থাকলেও এতে কবির বিশেষ কোনো প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি। সুন্দরকে তিনি উৎকলের রাজপুত্র বলেছেন। কবি সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাব্যের শেষের অপ্রাসঙ্গিক আজগুবি গল্পের অবতারণা অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কাব্যটি নীরস হওয়ায় জনসমাজে প্রচলিত ছিল না। তবে দেবদেবীদের কৌতুকাবহ চরিত্র বর্ণিত হওয়াতে খানিকটা চিত্তাকর্ষী বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে।

৮.৯ শিবায়ন

● রামেশ্বর ভট্টাচার্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্পতম। এর মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিব সংকীর্তন' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রামেশ্বর ভারতচন্দ্রের পঞ্চাশ বছর আগে ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দেড়শো বছর পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন চিত্র, কাব্যকলা প্রভৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কবি বলতে হবে। তবে রামেশ্বর মুকুন্দের মতো প্রথম শ্রেণীর কবি নন, আবার ভারতচন্দ্রের রচনাবৈদগ্ধ্যও তাঁর ছিল না।

রামেশ্বর কাব্যের মধ্যে তাঁর গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদা পরগনার অন্তর্ভুক্ত যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। রামেশ্বরের পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী। কবির দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবি ১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের গ্রাম যদুপুর ত্যাগ করে কবি কর্ণগড়ের জমিদারদের সভায় পুরাণ পাঠকরূপে বসবাস করেন। তিতিন তাঁর কাব্যে কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ওতাঁর পুত্র যশোবন্দ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন—

রাজা রামসিংহ সুত যশোবন্দ নরনাথ
তস্য পোষা দ্বিজ রামেশ্বর

রামেশ্বরের দুখানি কাব্যগ্রন্থই প্রমাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। (১) শিবসংকীর্তন বা শিবায়ণ (২) সত্যপীরের ব্রতকথা। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নিঃসন্দেহে শিবায়ন।

রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন সাতপালা ও জাগরণ আর পালায় সমাপ্ত। প্রথম থেকে তৃতীয় পালায় পুরাণাশ্রিত কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। শিবের বিবাহ পর্যন্ত কাহিনী এতে আছে। কবি পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি পৌরাণিক ও ক্লাসিক সাহিত্য থেকে এই অংশের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

হর পার্বতীর বিবাহের পর থেকে পৌরাণিক ও কাহিনীর পরিবর্তে কবি ক্রমশ লৌকিক শিবের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বরবেশী শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ, শিবের মোহন মূর্তিধারণ, হরগৌরীর বিবাহ দিয়ে তৃতীয় পালা শেষ হয়েছে। চতুর্থ পালায় শিবের গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এতে মহাদেবের ভিক্ষা উপজীবিকা, হরগৌরীর কলহ ইত্যাদি বর্ণিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও বিবাহ উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান বর্ণিত। যথার্থ লৌকিক কাহিনী ষষ্ঠ, সপ্তম ওজাগরণ পালায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণ এবং সপ্তম পালায় বাগ্‌দিনী বৈশিনী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মৎস্য ধরা, শিবকে ছলনা করে দেবীর কৈলাসে প্রস্থান এবং শিবেরও কৈলাসে যাত্রার কাহিনী বর্ণিত। জাগরণ পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর স্বামীর কাছে শাঁখা পরবার বাসনা, শিবের অসামর্থ্যে অভিমানিনী পার্বতীর পিতৃগৃহ গমন ও শিবের কৈলাসে যাত্রা, শাঁখা পরিয়ে বৃদ্ধ শিবের পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টা এবং অবশেষে হরপার্বতীর পুনর্মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। কাব্যে কবির সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে শিবের গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায়। এই লৌকিক কাহিনীগুলি কোনও প্রামাণ্য পুরাণে পাওয়া যায় না। কেবল নন্দিকেশর পুরাণে কিছু পরিমাণে শিবের কৃষিকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই লৌকিক কাহিনীতে দরিদ্র শিবের গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কহল, চাষবাস ও মাছধরা প্রভৃতি বর্ণনায় পুরোপুরি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষিত। বিশেষ করে শিবের কৃষিকার্য ও ধন্য রোপণের কাহিনীতে ব্রাহ্মণ কবির কৃষিকর্ম বিষয়ে নিপুণ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ইন্দ্রের কাছ থেকে শিবের জমির পাট্টা নেওয়া আর কুবেরের কাছ থেকে বীজধান কর্জ করার বৃত্তান্তে মধ্যযুগে শোষণ আর বঞ্চনার শিকার সাধারণ বাঙালি কৃষাণের জীবন চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর বাংলা সাহিত্যের ভূমিকায় বলেছেন—"এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরানীর জীবনকাহিনী।"

আবার পার্বতীর মান-অভিমান, দারিদ্র্যের সংসার, পুত্র কন্যাদের জন্য চিন্তা, নিষ্কর্মা স্বামীর ভিক্ষুক বৃত্তি ও চারিত্রদুষ্টি তাঁকে চিন্তাভার পীড়িত সাধারণ গৃহিনীতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে শিবের লাম্পট্য দোষও যেন সমকালীন এক শ্রেণীর মানুষে চিরত্রে শিথিলতার প্রকাশ।

রামেশ্বরের কাব্যের হাস্য কৌতুকে ভারতচন্দ্রের মতো মার্জিত নাগরিকতার চাকচিক্য নেই, আছে গ্রাম্য কৃষাণ জীবনের স্থূলতা ও সারল্য। পুত্র সহ মহাদেবের ভোজন এবং দুর্গার পরিবেশনের বর্ণনা খুবই চমৎকার—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী
দুই সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥
* * * * *
কার্তিক গণেশ বলে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরি খা॥

সকলের ভোজনের শেষে দেবী অন্নগ্রহণ করলেন। মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন জীবনই যেন এখানে প্রতিফলিত। ঈশ্বরী পাটনী দেবীর কাছে সন্তানের "দুধে ভাতে" থাকার বর প্রার্থনা করেছিল। আর রামেশ্বরের কাব্যে সদ্যোবিবাহিতা কন্যার বিদায়ের সময় শাশুড়ী জামাতাকে অনুরোধ করেছেন—

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি॥
আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।
প্রীত কর্য যেমন জানকী রঘুনাথ॥

রামেশ্বরের কাব্যের কিছু কিছু বাক্য বিন্যাসও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন—

(১) দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্রে গলা কাটা

(২) পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

(৩) দারিদ্রে দোষের পর দোষ নাই আর।

(৪) শমের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে।

অনুপ্রাসের ব্যবহারে করিব শব্দালঙ্কার নির্মাণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে—

(১) খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।

(২) চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া জিরন্তর।

ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

তবে কবি অনেক সময় শ্রুতিকটু অপ্রয়োজনীয় অনুপ্রাসও ব্যবহার করেছেন।

রামেশ্বরের কাব্য পাঠ করে মনে হয় তিনি হিন্দু ধর্মের এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী ছিলেন। শিব শক্তির বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কবির গভীর নিষ্ঠা ছিল। কাব্যের নানা জায়গায় নিজের বৈষ্ণব ধর্মানুরক্তি তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন—

শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা যেই স্মরে।
বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে॥

এমনকি মহাদেবের মুখ দিয়েও তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় তিনি চৈতন্যদেবের উল্লেখও করেছেন, রামেশ্বর দেবদেবীর জীবন নিয়ে কিছু রঙ্গ কৌতুক করেছেন বটে, কিন্তু তাদের প্রতি কবির বিশ্বাস শিথিল হয়নি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি রামেশ্বর পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে মিলিয়ে, উজ্জ্বলতম অনুপ্রাসের সঙ্গে সরল গ্রাম্য বর্ণনায় খাদ মিশিয়ে গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমিকায় যা রচনা করেছেন, তা একযুগের জীবন্ত সমাজচিত্রই হয়ে উঠেছে।

৮.১০ অনুবাদ কাব্য

৮.১০.১ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রামায়ণ কাব্যের একজন বিখ্যাত কবি। রামায়ণ কাব্য ছাড়াও ইনি শিবায়ণ, বাগবতামৃত, মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদি বহু কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুনিরাম চক্রবর্তী। বাসস্থান মল্লভূমির নিকট। ইনি একাধিক মল্লরাজের প্রসাদ লাভ করেছিলেন। রাজার প্রচলিত 'রামায়ণ'-এ অঙ্গদ রায়বার', তরণীসেন বধ' ইত্যাদি স্থানের অনেক স্থলেই এই কবির সরল রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৮.১০.২ রমানন্দ ঘোষের রামায়ণ

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ তাঁর 'রামায়ণ' কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থটির বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য নেই। কিন্তু ভূমিকাংশে লেখা আত্মবিবরণী কৌতুকপ্রদ। নিজেকে তিনি বুদ্ধাবতার বলে প্রচার

করেছেন—ম্লেচ্ছাচারের আধিক্য থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির ব্যক্তিপরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও তিনি নিজেকে দ্বিজ-অংশ-সম্ভভূত, কোথাও বা আবার শূদ্রকুল জাত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে এক ও অভিন্ন, এবং উভয়েরই বুদ্ধদেবের রূপান্তর।

৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত

কাশীরামের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, দ্বৈপায়ন দাস তাঁদের একজন।—

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।/অবহেলে গুণে যেন সকল সংসার।"/

আবার

"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন/এতদূরে পাওয়ার স্বর্গ আরোহণ।।"

ইত্যাদি কিন্তু দ্বৈপায়ন দাস সাথে মোটেই কোনো কবি ছিলেন, অথবা 'মহাভারত' কার ব্যাসদেবের (দ্বৈপায়ন) 'দাস' এর অভিধার অন্তরালে আত্মগোপন করে এক বা একাধিক কবির কবিকীর্তিলাভের এ প্রয়াস যে কথা সঠিক বলা চলে বা। দ্বৈপায়ন দাসের ভণিতায় প্রধানত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

সঞ্জয় মহাভারতের সবচেয়ে পুরোনো যে পুথি দুটি পাওয়া গিয়েছে, তার একটিতে অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করে থাকতে পারেন।

৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত

নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দরামের ভণিতায় উদ্যোগ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব পাওয়া গিয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণ। একটি ভণিতায় ক্ষেমানন্দ দাসের নাম আছে। ইনি নন্দরামের পুত্র অথবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। নন্দরামের ভণিতায় ভক্তিপরায়ণতার বেশ পরিচয় আছে।

৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্র এর ভাগবত

শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। তবে "ভাগবতামৃত" সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেভই রচিত। ভাগবতামৃতের সর্ব দেবদেবী বন্দনায় কবি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের নবরত্ন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।

এই মদনমোহন মন্দর নির্মাণ করেছিলেন দুর্জনসিংহ। মন্দির নির্মাণের কাল 'মল্লাব্দ ফণিরাজ শীর্ষ গণিতে" (১০০০ মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। অতএব এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে মন্দির নির্মাণের পর কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্য রচনার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক, একথা বলা যায়।

কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে সংকলিত কাহিনী। তবে অন্যান্য স্কধের জনপ্রিয় কিছু কিছু উপাখ্যানও তিনি পালা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর ভাগবতের দশম স্কন্ধে কাহিনীকে কবি যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করে কবি কাব্য রচনা করেন।

তবে কবি যে আক্ষরিক অনুবাদ করতে চাননি, তা তিনি নিজেই বলেছেন—

কেবা ব্যাসদেবের বুঝয়ে অভিপ্রায়।
ভাবর্থ ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র গায়।

কবির এই ভাবার্থ ব্যাখ্যায় অনেক সময়ই ব্যাসদেব ঢাকা পড়ে গেছেন এবং কালের হাওয়ায় বৈষ্ণব ভাপুকতার যে পরিমল প্রবাহিত হচ্ছিল, তাই-ই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এর উদাহরণ দেওয়া যায়। উদূখলের বন্ধনে বাঁদা পড়ে কৃষ্ণ যমলার্জুন উদ্ধার করলেন। এই হল ভাগবতীয় কাহিনী, পরে পরম বিস্ময়ে নন্দ এসে কৃষ্ণকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু কবিচন্দ্রের বর্ণনায় দেখি শ্রীদাম, সুদাম, প্রভৃতি সখার অনুরোধে বলরাম এসে ওজর ধরলেন, কৃষ্ণকে মুক্ত করে দেওয়া চাই। এতে ভাগবতের ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বৃন্দাবনলীলার বাৎসল্য ও সখ্য ভাবতরেক যুক্ত হয়েছে। মল্লরাজসভার বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বাস করে এবং রাজসভার উপযোগী কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবিচন্দ্র খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাগবত কাহিনীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত—ভাগবতের সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করেই কবি অনেক নতুন কাহিনী গড়ে তুলেছেন। যেমন কবি বর্ণিত গেড়ুঁ খেলার পল্লবিত কাহিনীটি 'ক্ষেপণের ক্ষিপতর ক্বচিৎ' অথবা "ক্বচিৎ বিল্বের ক্বচিৎ কুষ্মেভরর ক্ব চামলকমুষ্টিভির"-র মত শ্লোকাংশে সামান্য ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। এইভাবে গেঁড়ু অন্তর্হিত করার কাহিনী 'মিলায়নৈর' শব্দের ইঙ্গিতে, লুকা লুকী খেলার কল্পনাসূত্রে 'অস্পৃশ্য নেত্র বন্ধাদৈর'-তে, হাডু-ডু খেলার সূত্র 'দর্দুর প্লবৈঃ" রাখাল রাজা খেলার সূত্র "কর্হিচিন্নপচেষ্টায়"-র মধ্যে নিহিত আছে। ফল ভোজন, কিরাতীয় উদ্ধার ও কিরাত সহ কিরাতিনীর অন্তে স্বর্গ প্রাপ্তি প্রভৃতি উপাখ্যানের উৎসও ভাগবতের মাত্র দুটি শ্লোকের সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের ফল ভক্ষণের কাহিনী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির একটি পরিচিত প্রিয় প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তী শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকাদের কাব্যেও আমরা ভাগবতের দুটি শ্লোককে অবলম্বন করে কাহিনী বয়নের চেষ্টা দেখেছি। কিন্তু কবিচন্দ্র বেশ একটি পূর্ণাঙ্গ উপাখ্যান নির্মাণ করেছেন। এই নির্মিতিতে কবির যথেষ্ট কৃতিত্বও প্রকাশিত হয়েছে।

ফল ভক্ষণ কাহিনীতে বৃদ্ধ ফল বিক্রেত্রীর যুবতীতে রূপান্তিরত হওয়া, গৃহে প্রত্যাবর্তন ও তার স্বামীর তাকে অপরিচিতা রমনী ভেবে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা পূর্ববর্তী কোনো কৃষ্ণমঙ্গলের নেই। এগুলি কবির নিজস্ব কল্পনা। আর কিরাতের কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ মদনমোহন মন্দিরে কীর্তন নৃত্যরত আবিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের ছবিই যেন তুলে ধরে। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিক লব্ধ প্রত্যক্ষ জীবনের ছবিই এখানে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন বলে মনে হয়।

এ সমস্ত প্রসঙ্গ ছাড়াও ভাগবত পুরাণ বহির্ভুত কিছু কিছু কাহিনীও কৃষ্ণ কথার বর্ণনায় কবি গ্রহণ করেছেন। যেমন কর্ঘমুনর পারণ, কোকিল সংবাদ ও দিবা রাসের কাহিনী ভবিষ্যপুরাণ থেকে গৃহীত বলে কবি উল্লেখ করেছেন, যদিও বর্তমান প্রচলিত মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণে এসব কাহনী নেই। অধিকাংশ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত এই কবিও পারিজাতহরণ হরিবংশ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, নারদ পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কপোত কপোতী সংবাদও ভাগবতের কাহিনী নয়। এর কোনো পৌরাণিক উৎসত্ত জানা যায় না। কাহিনীটিতে শত্রু ব্যাধ ক্ষুধাতুর হলে, তার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কপোত কপোতী নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অতিথি পরায়ণতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রেখেছে।

কলঙ্ক ভঞ্জনের নষ্টচন্দ্রদর্শড় প্রসঙ্গটি সম্ভবত ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ থেকেই গৃহীত। তবে পদ্মপুরাণেও এই কাহিনীটি রয়েছে।

চতুর্থত—এই কবির কাব্যের কিছু কাহিনী প্রত্যক্ষভাবেই গোস্বামীদের কৃষ্ণকথার উত্তরাধিকার। যেমন মুক্তা চাষের কাহিনী। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'মক্তাচরিত্রের' প্রভাব এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কবি মুক্তাচরিত্রের প্রাথমিক ঘটনাটুকুমাত্র এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, পুরো কাহিনীটি বর্ণনা করেননি। কৃষ্ণকালী সংবাদ, রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ মাধবের কাহিনী-কৃষ্ণের গৌরী মূর্তি ধারণের প্রসঙ্গজাত বলেই মনে হয়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা এই ধরনের কাহিনী পেয়েছি।

আবার এমন কিছু কিছু কাহিনী কবিচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, যা হয় তাঁর কপোল কল্পিত, নয় কোন লৌকিক উৎস সঞ্জাত। যেমন কাঠুরিয়া ভক্তি কাহিনী, মূষিক মার্জার লীলা প্রভৃতি। দাতা কর্ণের কাহিনীও মহাভারত কিংবা জৈমিনীয় সংহিতায় নেই, প্রসঙ্গটি জন্ম বাংলাদেশেই।

ভাগবতবতের 'গোবিন্দমঙ্গল' সম্পাদক যে গুরুদক্ষিণা পালাটি সংকলন করেছেন, তা কবিচন্দ্র শংকর চক্রবর্তীর রচনা নয়। কারণ কবিচন্দ্র লেগোর দক্ষিণে অবস্থিত পানুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি॥

কিন্তু যে শঙ্কর কবিচন্দ্র গুরু দক্ষিণা পালাটি রচনা করেছেন, তাঁর বাস বর্ধমান জেলার কুলচন্ত গ্রামে—"শঙ্কর রচিল যার কুলচন্ত বাস"। এই পালাটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৫তম অধ্যায়ের কাহিনী অবলম্ভবনে রচিত। গুরুদক্ষিণার কাহিনী অবশ্য অগ্নিপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতেও দেখা যায়। কিন্তু ভাগবত পুরাণের কাহিনীতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে, অন্য পুরাণের কাহিনী থেকে একে সহজেই পৃথক করা চলে। যেমন শঙ্করের বর্ণনায় শঙ্খানুর হরিবংশ অনুযায়ী তিমি মাছ নয় শঙ্খ। ভাগবতের কাহিনীতে যমরাজ ভক্তিতেই কৃষ্ণের গুরু পুত্রকে প্রত্যার্পণ করেছিলেন, কিন্তু হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রত্যর্পণ করেন। শঙ্কর এখানে ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কাহিনী বয়সে ভাগবতকে অনুসরণ করলেও কিছু কিছু প্রসঙ্গে কবি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি হেতু যমলোকে বন্দী সমস্ত পানীয় উদ্ধার প্রসঙ্গটি অভিনব। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংকলিত এই পালাটির আরও একাধিক পুথি পাওয়া যায়। যেমন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৬/প্রথম সংখ্যা) প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রসঙ্গে ২৪৬ সংখ্যক পুথিটি শংকরের গুরুদক্ষিণা পালার।

৮.১০.৭ দীন বলরাম দাসের ভাগবত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বলরাম দাস' অন্য বহু সমস্যার মতই এখনো পর্যন্ত সমাধানহীন একটি সমস্যা। গৌরপদ তরঙ্গিনীর সম্পাদক জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় সর্বাধিক সংখ্যক ১৯ জন বলরামের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ড. সুকুমার সেন মহাশয় তাকে কিছুটা কমিয়ে (৫ জনে) আনার গবেষণা করেছেন। কৃষ্ণলীলামৃত রচয়িতাকে তিনি অন্যদের থেকে পৃথক ব্যক্তি বলেই চিহ্নিত করেছেন। ইনি নিজেকে ভণিতায় 'দীন' বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য সব সময় যে করেছেন, এমন নয়—"কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে" ও ভণিতা হিসেবে দেখা যায়। এই দীন চিহ্নিত বলরাম দাস যে অন্যদের থেকে পৃথক, তা স্বীকার করা যেতে পারে। দীন বলরামের নামে যে দু'একটি পদ পাওয়া যায়, তাও হয়ত এঁরই রচনা হতে পারে।

বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত একটি কৃষ্ণলীলামূলক কাব্য, হেঁয়ালিতে কবি কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন—"অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনী যকায়/এই পরমাণে সকাদিত্য এক জায়।।" (অজমুখ = ৪, ভুজ = ২, অঙ্গ = ৬, অশ্বিনী = ১) অর্থাৎ ১৬২৪ শকাব্দ বা ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দ কবির কাব্য রচনা কাল।

বন্দনাদির পর বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে কবি কাব্য আরম্ভ করেছেন। দেখা যায় কাব্যের মধ্যে কবি গদাধর দাসের চরণ বন্দনা করেছেন—"শ্রীযুত গদাধর চরণ ভরসে।/কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে।।"

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ধারায় বলরাম দাসের কাব্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কাব্যটির গঠনই অন্য সমস্ত কাব্যগুলোর থেকে কবিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। সাধারণত শুক, শরদ জনমেজয়ের মুখ দিয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে পৌরাণিক রীতির অনুবর্তন করেই কৃষ্ণমঙ্গল কাহিনীসমূহ বয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বলরাম গ্রন্থারম্ভে একটি অভিনব কাহিনী

উপস্থাপন করেছেন— "মগদ্য দেশেতে এক রাজার কুমার/শুদ্রেতে কুলীর ছিল মহা অধিকার/ভুঞ্জিয়া বিসয় বাস তিক্ত হৈঞা মনে।/সকল ছাড়িয়া তিঁহো গেলা বৃন্দাবনে।।/ব্রজেতে কলি বাস বরিস দশেক।/সর্বশাস্ত্র পড়ি গ্রন্থ দেখিল অনেক।।/ইষ্টদেব স্থানে তিহোঁ বিদায় লইয়া।/প্রতি দেশে দেশে তিহোঁ বেড়ান ভ্রমিয়া।/ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মৎস রাজার দেশে।/পাঞ্চাল নগরে রাজার করিলা প্রবেশে।।/জমুনার হেন কথা দুকুলে নগর।/তটের উপরে দির্ব্ব স্থান মনোহর।/

****

নদির তীরেতে এক বটবৃক্ষ আছে।/পথশ্রম পাঞা তেহো গেলা তার কাছে।/পরম সিতল ছায়া স্থান মনহর।/দেখিয়া হরিন বড় হইলা অন্তর।/বসিলা বিবেক গ্রন্থ রাখিয়া ভূমিতে।/বেলা অবসান দেখি লাগিল ভাবিতে।/

****

এই মতে বসিয়া করেন আলোচনা।/দিবর্ব এক নিতান্তিবনী তথা আগোমন॥"

ইনি আত্ম পরিচয় দিলেন—

শোকুলেতে জন্ম মোর নাম সত্যবতী।/শিশুকাল হৈতে করি গোবিন্দয-ভকতি॥/

****

আমার বাসাতে চল বৈষ্নব গোসাই।/করিবে তোমার সেবা মোর জেষ্ঠ ভাই॥

আর এক আছে মোর কনিষ্ঠা ভগিনী।/অলপ বত্রসে রাড়ি সেই অভাগিনী।/

যাই হোক বিবেকী শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন। এই পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়। সন্ধ্যাকালে সত্যবতীর অনুরোধে বিবেকী কৃষ্নকথা আরম্ভ করলেন। বর্ণনায় খন্ডিতা, বাসকসজ্জিকা, কলহান্তরিতা, প্রভৃতি রূপ নির্দেশিত রস পর্যায় যে বিবেকীর ভালভাবেই রন্ত, তা বোঝা যায়। একটি দৃষ্টান্ত উৎকলিত হতে পারে—

"যেহেতু কলহ জন্মে কহিত্র তোমারে।/নাম না জন্মিলে রস পুষ্টি নাহি ধরে॥/

নাইকা ছাড়িয়া অন্য নাইকার ঘরে। রসের লালসে যদি নিরসক্তি করে॥/

সে কথা বেক্ত যদি হয় তার আগে।/মাণিনীর ভক্ত যদি হয় অনুরাগে॥'

এছাড়া কাব্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসেবে চিত্রণও রূপ গোস্বামী প্রভাবিত। সমস্ত কাব্যটির বুনুনী এই বিবেকী সত্যবতীর প্রশ্নোত্তর গ্রথিত। গঠনের দিক থেকে কাব্যটি যে অভিনব তা স্বীকার করতেই হবে। এছাড়া কাব্য কাহিনী সম্পূর্ণ প্রেম ভক্তির ভোরে গাঁথা ব্রজলীলার উপাখ্যান। ঐশ্বর্য বর্ণনা কবি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্নের মথুরা গমনে গোপীদের খেদে কাব্য শেষ হয়েছে। কাহিনীর উৎস নির্দেশ করে বলা হয়েছে—"ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে জে কহিল ভাগবতে/তাহা আমি করি বিরেচন।" বর্ণনার ক্ষেত্রে করিব ক্ষমতা নিতান্ত মন্দ নয়। নায়িকার মানে কৃষ্নের বিরহ অবস্থার একাংশ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়—

"বিরহে ব্যাকুল কৃষ্ন হইঞা হৃদএ তৃষ্না
ঘন ঘন ছাড়েন নীশাস।
মাগধী তলাতে বসি ফেলাঞা হাতের বাশি
নি(ি) রক্ষণ করে দিগ পাষ॥

পথে রাধা না দেখিয়া পড়ে মূর্ছাগত হৈঞা
পুন উঠে পথ পানে চায়।
মুণ্ডে (?) পানি হানি কহে আজি প্রাণ নাহি রহে
কি হইল করে হায় হায়॥"

৮.১০.৮ দ্বিজ রমানাথ-এর ভাগবত

এই কবির কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কাব্যটিতে পৌরাণিক কাঠামোর অনুসরণে শুক, নারদ, অথবা পরীক্ষিত জনমেজয়-এর কথোপকথনে কাহিনী বিকৃত হয়নি। কাহিনীর বক্তা কবি নিজেই অবশ্য এর আগেও কখনও কখনও স্বয়ং কবিকে বিবৃতিকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। কাব্য প্রারম্ভে দেবকী ও যশোদার সাধনা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য তাঁরা কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেন, সেই তপস্যার সময়—

—ধরিল শিশুর বেশ দেব নারায়ণ।
দেবকী নিকটে আসি দিলা দরসন॥
দেবকী আছেন চক্ষু মুদ্রিত হইআ।
ছল করি কৃষ্ণ তোথা দান্ডাইল গিয়া।
নিজরূপ ধরি প্রভু দৈবকীরে কন।
কি হেতু করহ তপ থাকিআ নির্জন॥

তখন দৈবকী বর চাইলেন "তুমা হেন পুত্র জেন এই জন্মে পাই।।" যশোদাও সেই প্রার্থনা করলেন।

ধরা দ্রোণ, সুতপা, পৃশির তপস্যার প্রসঙ্গ ভাগবতেও বর্ণিত হয়েছে। এঁরাই পরে যথাক্রমে যশোদানন্দ ও বসুদেব দেবকী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কবি সেই প্রসঙ্গ পরিবর্তিত করে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এরপর কাহিনী যথারীতি ব্রহ্মার নিকট পৃথিবীর দুঃখ জ্ঞাপনে আরম্ভ হয়েছে। দেবকীর বিবাহ, কংসের প্রতি দৈববাণী ইত্যাদি ভাগবত নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভণিতাংশে কবির নাম বেশ কয়েকবার পাওয়া যায়। যেমন—

(১) দ্বিজ রমানাথ বলে গোবিন্দ কৃপায়॥
(২) দ্বিজ রমানাথ বলে কৃষ্ণের কৃপায়॥
(৩) অঘাসুর বধ করা শুনে জেই জনে।
তার সত্রু নাস জায় রমানন্দ ভনে॥

পুথিতে ভাগবতের কাহিনী, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, মুখব্যাদনকারী কৃষ্ণের মুখ গহ্বরে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন, গর্গের নামকরণ, উদুখলে বন্ধন, বৎসাসুর বধ, বকাসুর ও অঘাসুর বধ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য প্রসঙ্গের তুলনায় কালীয়দমন প্রসঙ্গ দীর্ঘ। এছাড়াও কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পেতে চেয়ে গোপীগণের কাত্যায়নী পূজার কাহিনীও এখানে আছে— "নন্দের নন্দনে দুর্গাস্বামী করি দিব।" কবি বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গও বর্ণনা করেছেন। যজ্ঞস্থানে রাখালদের অন্নপ্রার্থনা, ঋষি পত্নীদের কৃষ্ণকে ভোজন করানো, গোবর্ধন, ধারণ, কুক্ষণে, স্নানের সময় বরুণের অনচর কর্তৃক নন্দকে হরণ ও কৃষ্ণের নন্দ উদ্ধার প্রভৃতি ভাগবতীয় কাহিনী বর্ণিত। এছাড়াও অবিষ্টাসুর বধ, ব্যোমাসুর বধ ও অক্রুরের ব্রজে আগমন, কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা, গোপীগনের বিলাপ, পথে যমুনায় স্নানকালে

অক্রুরের জলের মধ্যে রামকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন, কৃষ্ণের মথুরায় আগমন রজক হত্যা ও শিশুগণকে বস্ত্র বিতরণ পর্যন্ত কাহিনীর পর পুথি খণ্ডিত হয়েছে।

এই সমস্ত পৌরাণিক প্রসঙ্গ ছাড়াও এই কাব্যে দানলীল, নৌকালীলা ও জলক্রীড়ার কাহিনী আছে। দানলীলার বর্ণনায় কবি বলেছেন—

'আর রপে গেলা কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
দানছলে রহিলেন কদম্বের তলে॥
হোথা সে শ্রীমতি গিয়া সখি ডাকে বলে।
বিধাতা কলি যদি গো গোয়ালার জাতি।
দধিদুগ্ধ বিকিকিনি এই মোদর বিত্তি।

রাধা সঙ্গে বড়াইকেও নিলেন, এরপর রাধা কৃষ্ণের কাছে উপনীত হলে, কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

নিতি নিতি জাহ বিকে দান দেহ কোন লোকে
ভুলিইয়া গেছ বহু দানি॥

গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলার বড়াই র ভূমিকাটি খুবই সক্রিয়। দানী দান চাইলে সমস্যায় পড়েছেন গোপীরা। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল বড়াই এবং সমস্যার সমাধানও করল।

নৌকালীলার বর্ণনাও রয়েছে। নৌকালীলার পর রাস, কাত্যায়নী ব্রত ও শঙ্খাসুর বধের পৌরাণিক প্রসঙ্গের পর কৃষ্ণ ও গোপীদের জলক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। জলক্রীড়া প্রসঙ্গে চন্দ্রাবলী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চন্দ্রাবলী এখানে রাধার সঙ্গে এক নয়, পৃথক চরিত্র। জলক্রীড়ার সময় চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ায়, কে চুরি করেছে জানার জন্য সবার বস্ত্র আভরণ ঝেড়ে দেখা হল। জলক্রীড়ার প্রসঙ্গ পরিচিত হলেও চন্দ্রাবলীর নূপুর হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি কবির কপোলকল্পিত।

এ কাব্যে দু একটি রাগিনীসহ কিছু প্রদত্ত পাওয়া যায়। যেমন কালীয় দমন বর্ণনাকালে একটি করুণারাগের পদাংশ—

কোথাকারে গেলিরে প্রাণের কানাই রে
তোমা বিনে সখা কেহো নাঞি রে।

অপর একটি পদের রাগ মালসি, গোবর্ধন ধারণ লীলায় যুক্ত হয়েছে। মল্লার রাগে আর একটি পদ আছে। এছাড়াও ধনশ্রী, কামদ, বিভাস প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। এই পুথিটি ঠিক বিশুদ্ধ আকারের পাওয়া যাচ্ছে না। একটি ভণিতায় আছে—

হেন বেলে কোকিলের কলরব শুনি
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণরস বাণি।

এরপর রাসের বর্ণনা রয়েছে। অথচ চৈতন্যোত্তর কালের পরিচিত বৃদ্ধাদূতীর চরিত্রটি এখানে উপস্থিত—

এত যদি বলিলেন রাই বিনোদিনী।
কান্দে কান্দে বলে বৃদ্ধা আধ আধ বাণী।

পুথিটি যদি নির্ভেজাল হত, তাহলে রমানাথের পরিচয় স্পষ্ট হত।

৮.১১ শাক্ত পদাবলি

● রামপ্রসাদ সেন

বাংলা ভক্তি সংগীতের ধারায় শ্যামাবিষয়ক পদরচনার ঐতিহ্যের প্রবর্তক রামপ্রসাদ। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত কবির পদগুলি লোকমুখে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, নতুন গড়ে ওঠা কলকাতা শহরের ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে রামপ্রসাদের পদের অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হয়েও রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন ঃ— "ব্রহ্মণে আমরা একটি ধর্মসঙ্গীত রচয়িতা সাধু পুরুষের নিকট আগমন করিতেছি। তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষায় রচিত এবং বঙ্গদেশে সর্বস্থানে পরমার্থ সাধক বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাঁহার নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। যখন কলিকাতায় রাত্রিতে রাতভিখারিদিগের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তের অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে, তাহা বজলা যায় না।"

ভক্তির এই সহজ উৎসারণেই রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ তিন তান্ত্রিক সাধক, এইরূপ পরিচিতি তাঁর ভক্তি ভাবনাকে যেন সঠিকভাবে চিহ্নিত করে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন—

"(রামপ্রসাদ) সাধকরূপে প্রাচীন তন্দ্র সাধনা পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কবি রূপে তাঁহার প্রকাশরীতি ও অনুভুতির স্বকীয়তা আধুনিকত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁহার পদাবলিতে রূপবর্ণনা ও সাধনাক্রম নির্দেশ প্রাচীন সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। কিন্তু মাতৃরূপিনী বিশ্বশক্তির সহিত পরিচয় স্থাপনের প্রচেষ্টা মধ্যে তাঁহার যে মানবিক আবেগ-আকৃতি ও দুরূহ তত্ত্বে অনুপ্রবেশ শীলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আধুনিক।" রামপ্রসাদের পদে তান্ত্রিক উপাসনার সাধন সংকেত থাকলেও প্রকৃত ভক্ত কবি কোথাও উপচার বা মন্ত্র তন্ত্রের যান্ত্রিকতাকে সহজ ভক্তির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেননি। পুনরায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণ করা যায়—

"তন্দ্রসাধনায় সুকোমল হৃদয় বৃত্তির বিশেষ কোনো স্থান নাই—বরং সাধারণ প্রবৃত্তির উৎপাদনের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। নারী লইয়া সাধনা, মদ্যমাংসের উপচার, নরবলি, কৌমার্যহরণ প্রভৃতি নৃশংসাচার। শ্মশানের ভয়াবহ পরিবেশে পূজানুষ্ঠান এ সমস্তই সহজ জীবনযাত্রা ও ভক্তি নিবেদন প্রণালির বীভৎস ব্যতিক্রম। এই কঠোর তপসচর্চা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দয়া মায়া প্রীতি মান অভিমান আত্মনিবেদন প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়াবেগের উৎসারণেই রামপ্রসাদের মৌলিকতা। বীভৎসের মধ্যে মধুরের আবিষ্কার প্রলয়ংকারী ধ্বংসলীলায় উন্মত্তা কালীমূর্তির নৃশংসতার অন্তরালে স্নেহ মমতাময়ী মাতার স্পর্শ, জীবনের সমস্ত জটিলতার পিছনে এক মায়াময়ীর রহস্যজাল বিস্তারের অনুভূতি, ইহার সমস্ত বিভ্রান্তি বঞ্চনার মধ্যে পরম সান্ত্বনার নিশ্চিত আশ্বাস—এই মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া রামপ্রসাদ দেবী ও মানবের সম্পর্ক রহস্যকে এক সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, কলকাতা তখনও এমন কিছু নগর অভিধা পায়নি। তবু রাজসভার অস্তিত্বে, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষদের অবস্থান গৌরবে, দেশের বহমান অর্থনীতির কেন্দ্রীভবনে, উচ্চশ্রেণীর শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্যবোধে, বিলাসব্যসনে ও শ্রেণী বৈষম্যের কারণ সৃষ্টিতে এক জাতীয় সামাজিক নাগরিকতা বা সোশ্যাল আরব্যানিটি গড়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রর কাব্য সেই অর্থে নাগরিক কিন্তু রামপ্রসাদের পদ সেই তুলনায় সম্পূর্ণ কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণসমাজের সৃষ্টি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেছিলেন ঃ-"রামপ্রসাদের ভক্তিসাধনার পদগুলিতে বাংলার গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিবত হইয়াছে। ইহা কিন্তু সত্যকার গ্রাম জীবন, ইহার মধ্যে কোনো

ভাবাদর্শগত রূপান্তর কল্পনাবিলাস নাই। এই গ্রামজীবন অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতীক, কিন্তু ইহা স্বধর্ম হারায় নাই, ইহার অঙ্গবিন্যাসে রক্তমাংস উবিয়া যায় নাই।"

রামপ্রসাদের আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকুতি পর্যায়ের গান বাঙালির চিরকালের সম্পদ। তিনি নিজে তন্ত্র সাধক ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্র সম্মত আবার নিষ্ঠ কর্ম কাও পরিহার করে সাধারণ মানুষের কর্মক্লিষ্ট জীবনের সহজ মাতৃ ব্যাকুলতায় ভক্তিকে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবৎকাল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। এই সময় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ বন্ধন ব্যক্তিতান্ত্রিকতার আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে। বিশ্বাসের জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে সংশয়। রামপ্রসাদের গান এই সংশয়পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে আলোর সংকেত। তাঁর আগমনী ও বিজয়াগানে বাঙালির একটি সামাজিক প্রথা রূপায়ণ। কন্যা বিরহাতুরা মেনকার বেদনায় এই পদগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝঘড়া জামাই বলে মানব না।

আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের গান বাংলা ভাষায় প্রথম কে রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে প্রাপ্ত লিখিত পদের মধ্যে রামপ্রসাদই সম্ভবত প্রাচীনতম কবি। রামপ্রসাদের এই আগমনী বিজয়া পদগুলি গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ-মমতা বাৎসল্য রসে সিঞ্চিত। তবুও কবি কখনও কখও পাঠককে মনে করিয়ে দেন গৃহাগত কন্যা আসলে জগজ্জননী বিশ্বপালত্রী মহামায়া, নিছক লীলা বসে তাঁর মানবীরূপ কন্যারূপ ধারণ করা। রামপ্রসাদ তাঁর একটি আগমনী, বিজয়াপদে ব্রজবুলিমিশ্রিত ভাষায় বৈষ্ণবপদাবলির গোষ্ঠলীলার অনুসরণে উমাকে বৈষ্ণবীয় গোষ্ঠপদের কৃষ্ণের মত বেণুবাদীকা ও ধেনুচারণরত মূর্তিতেও দেখেছেন।

উপাস্যতত্ত্বের পদেও রামপ্রসাদ বৈষ্ণবপদাবলির প্রভাবে শ্যামাজননীকে দিয়ে রাসলীলার শাক্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। আবার কখনও রামপ্রসাদ তাঁর পদে স্থূল মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে বিশ্বব্যপ্ত বিমূর্ত মহাশক্তির মহিমা কীর্তন করেছেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।
করে অসি মুণ্ডমালা সে মা-টি কি মাটির বালা
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে।

কখনও কখনও রামপ্রসাদ তাঁর পদে প্রত্যহের পরিচিত বস্তু বা বিষয়ের নিপুণ রূপক ব্যবহার করে তাঁর দেহাধীন জীবনের কর্মভার ও সংসার গ্লানিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শক্তি উপাসনার ক্ষেত্রে তিনি একটি উদারনৈতিক চেতনার প্রবর্তন করেন। রামপ্রসাদের এই ধর্মীয় উদারতারই মূর্ত রূপ দেখা যায় পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

● কমলাকান্ত

বাংলার শাক্তপদ সাহিত্যের আর একজন কবি ও সাধক প্রায় রামপ্রসাদের মতই গৌরভ লাভ করেছেন। ভক্তিরস, সঙ্গীতরস ও কবিত্বে তিনি প্রায় রামপ্রসাদেরই সমতুল্য। তিনি বর্ধমান নিবাসী সাধক ছিলেন। বর্ধমানের রাজারা তাঁকে বিশেষভাবে ভক্তি করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বর্ধমান রাজবাটী থেকেই তাঁর প্রামাণিক পদ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাঁর

পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা গ্রাম। তাঁর চরিত্রেও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান রাজেরা তাঁকে সভাপণ্ডিতও করেছিল। রামপ্রসাদের মতই তাঁর জীবনও নানান অলৌকিক গল্পে পূর্ণ। মৃত্যুকালে যখন তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়, তখন মুমূর্ষ কবি ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলেন যে যেহেতু গঙ্গা দুর্গার সপত্নী তাই তিনি গঙ্গার তীরে যাবেন না। তাঁর জীবনের সাল-তারিখ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে প্রায় ৫০ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় ৩০০ পদ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর শাক্ত সঙ্গীতগুলিকে রামপ্রসাদের সাধকসঙ্গীতের উত্তরাধিকার বলে মনে করা হয়। কমলাকান্তের আগমনী পদগুলি অবশ্য সেই তুলনায় ঠিক ভক্তিগীতি নয়, বরং কবিওয়ালাদের মত মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। কমলাকান্তও যথারীতি মেনকাকে দিয়ে শরৎপ্রভাতে কন্যার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। সেই স্বপ্নে দুর্গা-রূপের সঙ্গে কমলাকান্ত উপাসিত কালিকারূপের স্মৃতি মিশে গেছে। কমলাকান্তের একাধিক পদে মেনকার স্বপ্ন দর্শন কাব্যের বিষয় হয়েছে। স্বপ্ন ব্যথিতা জননী মেনকা আপাত নিশ্চিন্ত গিরিরাজকে কন্যা আনয়নের জন্য নানা ভাষায় অনুরোধ, অনুনয়, তিরস্কার ও গঞ্জনা জানিয়েছে—

কবে যাবে বলো গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হইয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে
কী আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি তেই হে তোমারে সাধি
নারীর জমন কেবল যন্ত্রণা সহিতে।

বাঙালি মায়ের কন্যাবিরহের বাস্তব বেদনা আগমনী বিয়জা পর্যায়ের গানগুলিকে একটা স্বতন্ত্র মানবিক মাধুর্য দান করেছে। এছাড়াও কালিকার স্বরূপ এবং কবির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সংক্রান্ত কয়েকটি গান রামপ্রসাদের থেকে কোনো দিক দিয়ই নিকৃষ্ট নয়, বরং কবিত্ব বিচারে উৎকৃষ্ট। যেমন—

১. সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি॥

২. তাই শ্যামারূপ ভালোবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী॥

এ সমস্ত গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ় সংবদ্ধ। বরং রামপ্রসাদের ভাষা কিছুটা শিথিল ধরনের। কবির মনোভাবও খুব উদার ছিল। শ্যাম ও শ্যামাকে একীভূত করে তিনি লিখেছেন—

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥

হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥

আবেগ, কল্পনা, ভক্তিভাব ও রচনারীতির এরকম সুষ্ঠু সমন্বয় রামপ্রসাদকে ছেড়ে দিলে আর কোন শাক্তপদকারের রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। কবি কিছু কিছু বৈষ্ণবপদও লিখেছিলেন, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তার মূল্য বেশি নয়।

৮.১২ নাথসাহিত্য

নাথ সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল থেকে সাধনভজন করে আসছিল এবং এখনও এরা বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতি ছড়া গান ও আখ্যানকাব্য বাংলাসাহিত্যের আদিপর্ব অর্থাৎ দশম দ্বাদশ শতব্দীর দিকে রচিত হয়েছিল। কিন্তু আদিনাথ-মীননাথ কাহিনীর শুরু অষ্টম শতকে। গোপীচাঁদের গান সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীতে। কিন্তু ময়নামতীর গান লোকসাহিত্য হিসেবে বিংশ শতাব্দীতেই সংগৃহীত ও মুদ্রিত হয়েছে।

মৌখিক নাথ সাহিত্যের ভাষা আঞ্চলিক ও আধুনিক। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে হাজার বছর আগেকার জীবনচেতনার, জীবনযাত্রার, সমাজের ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন ও আভাস মেলে।

নাথ সাহিত্য বলতে আমরা নিম্নলিখিত রচনাগুলিকেই বুঝি—

(১) গোরক্ষ বিজয় (২) মানিকচন্দ্র রাজার গান (৩) ময়নাবতীর গান (৪) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস (৫) যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত (৬) চৌরঙ্গীনাথ (৭) সাধন মাহাত্ম্য (৮) যোগীর গান (৯) যোগীকাচ (১০) যোগ চিন্তামণি।

হিন্দি-মারাঠী-উড়িয়া-তিব্বতী ভাষায়ও এইসব কাহিনী প্রচলিত আছে। বিশেষ করে মীননাথ গোরক্ষনাথ কাহিনী সর্বভারতীয় এবং নেপালে তিব্বতেও প্রচলিত।

এই নাথপন্থীরা নানা ধরনের যৌগিক, তান্ত্রিক, রাসায়নিক, আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ভিষগ্‌বিদ্যার সাহায্যে জড়দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ক করে তার সাহায্যে মোক্ষমুক্তি নির্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন। এক কথায় এঁদের যোগী সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ এঁদের সাধনার দার্শনিক ভিত্তি পতঞ্জলির যোগ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নাথ ধর্মে যে নজন গুরুর কতা জানা যায় বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও তাঁদের পূজা করতেন। চর্যার পদে ও টীকায় নাথ ধর্ম ও নাথ গুরুর উল্লেখ আছে।

নাথ সাহিত্যে সমস্ত কাহিনীর মধ্যে দুটি কাবিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) গোরক্ষনাথের মহিমা বিষয়ক কাহিনী এবং (২) ময়নামতী-গৌপীচন্দ্রে গান।

গোরক্ষনাথকে নিয়ে শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশেই নানা ধরনের গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে আবার অনেকে ঐতিহাসিক পুরুষও বলতে চান।

অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় তাঁর কাল বলা হয়। তিনি উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারতেই কোন সময় বর্তমান ছিলেন। পরে শিব-মৎসেন্দ্রনাথের পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে তাঁর কাহিনী জুড়ে গিয়ে তিনি পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

গোরক্ষ বিজয়ের তিনখানি পুঁথি পাওয়া যায় (১) ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কবি শ্যামদাস সেনের মীনচেতন (২) মুন্সী আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয় (৩) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের গোর্খ-বিজয়। যোগী সম্প্রদায়ের গায়কেরা এই তিনজনের রচনাকেই একসঙ্গে গ্রথিত করে গান করে থাকেন।

গোরক্ষ বিজয় মীন চেতননের আখ্যানে নাথ সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ গোরক্ষনাথ কিভাবে তাঁর পথভ্রষ্ট গুরুকে নারীমোহ থেকে উদ্ধার করলেন একাব্যের মূল কাহিনীতে তারই পরিচয় আছে। আদিপুরুষ নিরঞ্জনের মুখ থেকে শিব, নাভি মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদ, কান থেকে কানুপা এবং জটা থেকে গোরক্ষনাথের জন্ম হল। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে জন্মালেন গৌরী। গৌরীকে শিব বিয়ে করলেন নিরঞ্জনেরই আদেশে। এরপর মীননাথ ও হাড়িপা মহাদেবের শিষ্য হলেন, গোরক্ষনাথ মীননাথকে গুরু বলে বরণ করলেন এবং কানুপা হলেন হাড়িপার শিষ্য।

এরপর তাঁরা সবাই যোগী হ তপস্যায় বসলেন। একদিন শিব গোপনে গৌরীকে “মহাজ্ঞান” তত্ত্ব বোঝানোর সময় মীননাথ মাছের রূপ ধরে তা শুনে নিলে ক্রুধ শিব তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি যা শুনেছেন তা ভুলে যাবেন। এরপর একদিন শিবের শিষ্যদের চরিত্র শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পার্বতী তাঁদের নিমন্ত্রণ করে অন্ন পরিবেশন করতে লাগলেন। অন্য সবাই তাঁর অসামান্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ তাঁকে জননীরূপে কল্পনা করলেন। তখন দুর্গা অন্য সবাইকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথকে তিনি আরও কঠোর পরীক্ষায় ফেললেন। এতেও গোরক্ষনাথ সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এরপর শিবের অনুরোধে বিবাহ করেও গোরক্ষনাথ পথে বেরিয়ে পড়লেন এবং একসময় শুনতে পেলেন যে তাঁর গুরু মীননাথ কদলীরাজ্যে গিয়ে জপধ্যান বিসর্জন দিয়ে ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর বিন্দুনাথ নামে একটি পুত্রও জন্মেছে। গোরক্ষনাথ তাঁর গুরুকে সংসার মোহ থেকে নির্গত করে আবার যোগ সাধনার পথে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। গোরক্ষনাথ এজন্য প্রথমে বিন্দুনাথকে মেরে ফেললেন। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। তখন তিনি বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে দিয়ে কদলীরাজ্যের সব রমনীকে বাদুড় করে উড়িয়ে দিলেন। এরপর মীননাথ ও তাঁর পুত্র বিন্দুনাথ উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে শিবের অন্যতম শিষ্য গোরক্ষনাথের চরিত্র মহিমাই প্রধান হয়ে উঠেছে। গোরক্ষনাথের অবিচল মায়ামোহ বর্জিত নিরাসক্ত সন্ন্যাস জীবনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। আবার কদলীরাজ্যে নরীসঙ্গে মুগ্ধ মীননাথের চিত্রও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এই কাহিনীতে উচ্চতর কাব্যসৃষ্টির উপাদান থাকলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কারণ কবিরা ছিলেন বেশির ভাগই অল্পশিক্ষিত আর শ্রোতারাও ছিল নিরক্ষর। এই কাব্যধারার সর্বাধিক পরিচিত কবি হলেন শেখ ফরজুল্লা। কাব্যের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মহিমা যে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি, শিবদূর্গার চরিত্রচিত্রণ থেকেই তা বোঝা যায়। কিন্তু এই কাহিনী মধ্যযুগে সারা বাংলাদেশেই জনপ্রিয় হয়েছিল।

ময়নামতী গোপীচন্দ্রের গান এই ধারার আরগ এক জনপ্রিয় কাহিনী। বাংলাদেশের নানা জায়গায়, এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবন নিয়ে নানা সকরুণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীটির আদি উৎস বঙ্গভূমি এবং এখান থেকেই এটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা।

রাজা গোপীচন্দ্রে সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনীটি এই কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়। রানী ময়নামতী অদ্ভুত শক্তি মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তাঁর সেই দিব্যশক্তি বলে বুঝলেন যে রাজা মানিকচন্দ্রের তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। কিন্তু

মহাজ্ঞান গ্রহণ করলে মৃত্যু হবে না। রানী ময়নামতী রাজাকে তাঁর কাছ থেকে মহাজ্ঞান গ্রহণ করতে বললে রাজা তাতে স্বীকৃত হলেন না। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। যমদূতের সঙ্গে ময়নামতী তুমুল যুদ্ধ করা সত্ত্বেও রাজার প্রাণ বাঁচাতে পারলেন না। রাজার মৃত্যুর অল্পদিন পর ময়নাবতী পুত্র গোপীচন্দ্র জন্মগ্রহণ করল। গোপীচন্দ্রের বিবাহ হল অদুনা-পর্দুনা নামের দুজন রাজকন্যার সঙ্গে। ময়নামতী যখন তাঁর দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে জানতে পারলেন যে তাঁর পুত্রেরও স্বামীর মতই অকাল মৃত্যু হবে,তখন তিনি তাকেও হাড়িপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বারো বছরের জন্য সন্ন্যাসী হতে বললেন। কিন্তু তরুণ যুবক গোপীচন্দ্র তাঁর স্ত্রীদের ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে রাজী হলো না। অদুন-পর্দুনাও শাশুড়ীর বিরুদ্ধে গোপীচন্দ্রর সহায়তায় কলঙ্ক লেপন করলে। নিজের কলঙ্কহীনতা প্রমাণের জন্য ময়নামতী ছেলের কাছে পরীক্ষা দিলেন। এরপর বাধ্য হয়েই গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হল। ময়নামতীর গুরু হাড়িসিদ্ধা তাকে হীরানটির বাড়ীতে বাঁধা দিয়ে চলে এলেন। দেখতে দেখতে সন্ন্যাসের কাল শেষ হল। হাড়ি সিদ্ধা তাকে হীরানটির বাড়ী থেকে উদ্ধার করে মহাজান মন্ত্র দান করলেন। গোপীচন্দ্রে আর অকাল মৃত্যু হলো না। দুই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পরম সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এই কাহিনীর যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাতে দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস, সুকুর-মাহমুদ প্রভৃতি বিভিন্ন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। পুঁথিতে অবশ্য কাহিনীকে অল্প কিছু পরিবর্তিত করা হয়েছে।

গোপীচন্দ্রের কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে লোকের মুখে মুখে গীত হয়ে আসছে। এই কাহিনীর মানবিক আবেদন সম্পন্ন অংশগুলি বেশ বাস্তবতার সঙ্গেই বর্ণিত। বিশেষ করে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভাবনা জানতে ওপরে অদুনা-পদুনার কান্নার মধ্যে একটি করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। অনেকে গোপীচন্দ্রকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলেও মনে করেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কের কাছ থেকে গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে দেবনাগরী হরফে ঐ বছরের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গের রংপুরেই এই গানের সর্বাধিক প্রচলন আছে। এছাড়া এই গোপীচন্দ্রের গানের আরও নাা পুঁথি পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলিকে ঠিক প্রামাণ্য বলা যায় না। মৌখিক সাহিত্য হিসেবেই এটি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাসাহিত্যে চলে আসছে।

৮.১৩ মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পূর্ববক্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গীতিকা সংগ্রহ করে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে প্রকাশ করেন।

এই কাব্যগুলি আসলে লোকসাহিত্য। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে নামে একজন লোকসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কয়েকটি লোকগাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্র তাঁকে উৎসাহ দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে চন্দ্রকুমার দে, জলীমুদ্দিন ও আরও কয়েকজনকে বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে বিভিন্ন গীতিকা সংগ্রহ করেন। গীতিকাগুলির মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী, কমলা, কঙ্কও লীলা, মদিনা, দস্যু কেনারাম ইত্যাদি পালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপর এর আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয় 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে।

এই গীতিকা হল কবিতায় বা গানে বিবৃত লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তবজীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। গ্রামের একেবারে সাধারণ মানুষ নরনারীর প্রেমঘটিত কোনো রোমান্টিক আখ্যান, জমিদারদের দলাদলি বা ঐ জাতীয়

লোকজীবনের অন্য কোনো কৌতুহলপ্রদ ঘটনা নিয়ে ছড়া পাঁচালীর ঢঙে মুখে মুখে আখ্যানকাব্য রচনা করতেন। আর গায়েনরা তাতেই সুর দিয়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন।

এই গীতিকাগুলিতে যে জীবন ও যে সাজের ছবি উদঘাটিত হয়েছে, তা মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যের থেকে পৃথক। এখানে সমাজ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিনিধি নয়। দুষ্ট কাজী, চিকণ গোয়ালিনী, নেতাই কুটনী, ভাটুক ঠাকুর ও দুর্বলচিত্ত চাঁদ বিনোদ সমাজের একেবারেই পরিচিত চোখে দেখা মানুষ। এখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচিত্তের যে সংঘর্ষ তাতে প্রথার যান্ত্রিক মূঢ়তাই প্রধান উপাদান, ধর্মান্ধতা নয়। সংগৃহীত পালাগানের মধ্যে যেগুলোতে প্রেমপ্রণয়ের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট। এই প্রসঙ্গে মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি পালার উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিরপেক্ষ প্রেম বর্ণনা গীতিকাগুলির সম্পদ। এর রচনা সরল আবেগ, উচ্চতর প্রেমের আদর্শ, প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ প্রভৃতি গ্রাম্য কাহিনী কৃত্রিম সাহিত্যের মধ্যে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত করেছে। বিশেষত জাতি সম্প্রদায়হীন মানবপ্রেমের মহিমা বর্ণনার জন্য কৃষককবিরা পাঠকের প্রশংসা লাভ করেছেন। গাথাকেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের মধ্যে গীতিকাগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য গাথার থেকে বাংলা গাথাগুলি আবেগ, পবিত্রতা, ত্যাগ, সরলতার দিক থেকে অধিকতর প্রশংসনীয়। আবার বিপুল সংগ্রহের মধ্যে কিছু কিছু পালার কাব্যগুণ বিশেষ উৎকৃষ্ট নয়, নগণ্য। উদাহরণ হিসেবে হাতীধরা, জমিদারের বিরোধ, তীর্থ স্থান নিয়ে কলহ পালাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রণয়বিষয়ক পালাগুলিই উৎকৃষ্ট। এবং এই ধারার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পালা 'মহুয়া' তুলনাহীন এই পালাটিতে বেদে প্রতিপালিত 'মহুয়া'-র সঙ্গে উচ্চকুলোদ্ভব জমিদার নদ্যার চাঁদের বেদনামধুর লিরিক আবেগে কম্পমান প্রেমের গল্প বলা হয়েছে। এই লোকগাথাটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গাথা-সাহিত্যের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তথাকথিত ভদ্রসমাজে ঠিক এই ধরনের বিশুদ্ধ প্রেমের চিত্র এবং উদার সাম্প্রদায়িক মিলনের রূপ বিরল। ভদ্রসাহিত্যে অনেক পাণ্ডিত্য, কারুকার্য থাকতে পারে, কিন্তু গাথার অনাবৃত সন্দৌর্য এবং নিরাভরণ ঐশ্বর্য মধ্যযুগের পুঁথিজীবি সাহিত্যে পাওয়া যায় না বললেই চলে।

মৈমনসিংহগীতিকার ও পূর্ববঙ্গগীতিকায় রূপকথাসুলভ শব্দ ও বাক্যাংশ কবিদের প্রকৃতি বর্ণনার মৌলিকতা আর রূপ মুগ্ধতাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করেছে। এই জাতীয় কাব্যে আজল কাজল মেঘ, দাগলদীঘল কেশ, আগল ভাগল আঁখি, তেল ফুরাণ্যা বাতি, লীলারি বাতাস, আবের চাক্কামাখা পরভাত প্রভৃতি দ্বৈতশব্দ ও বাক্যাংশগুলি সজীব কল্পনার নিদর্শন এবং রূপচাঞ্চল্যের দ্যোতক।

এই কাব্যের প্রণয়লীলার যে পরিবেশ তা আগাগোড়া নিসর্গসৌন্দর্যমণ্ডিত। কিন্তু এছাড়াও জীবনের সাধারণ, অসুন্দর অংরে প্রতিও কবিদের পর্যবেক্ষণশক্তি কম তীক্ষ্ণ নয়। কেনারাম ডাকাতের চোহারা, যৌবনরিক্তা নারীর রূপহীন কুশ্রীতা, কবিরাজের ছোট চোখ ও থমথমে চলনভঙ্গী, সাঁওতাল হাঙ্গামায় উদ্বাস্তু নর-নারীর পলায়ন ত্রস্ততা প্রভৃতি তুচ্ছ সাংসারিক কথাও কাব্যটিতে স্থান পেয়েছে। দু'একটি গ্রামজীবন উপমার প্রয়োগ প্রমাণ করে যে কবির দৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র জীবন ক্ষেত্রেই প্রসারিত ছিল।—

মনের মাঝে নানান কথা নানান ভাবে উছে।
হরা (সরা) চাপা দিলে রে ভাত যেমন করি ফুটে॥

(নুরন্নেহা ও কবরের কথা)

কোন মার্জিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবির এই ধরনের উপমা ব্যবহার করতেন না। রূপকথা ও পল্লীগীতির ধূয়া ও বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী এই বাক্যগুলির মধ্যে সুষ্ঠু ভাব-ব্যঞ্জনার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে—

অন্ধকাইরা রাত্রির নদী সাঁ সাঁ করে পানি।
তার উপরে ভাসে ভাইরে পবন ডিঙ্গাখানি॥ (ভেলুয়া)

প্রভৃতি বাক্য সংযোজনারীতি লোকসাহিত্য বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে আধুনিক ভাষার ব্যবহার প্রচ্ছন্ন আছে তা বোঝা যায়। তা দিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা বাগিউত্তাত্ত আছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ক্ষিতীশ মৌলিক যে পালাগুলি সংগ্রহ করেন সেগুলির ভাষা একেবারেই যথাযথ রেখে প্রকাশ করা হয়েছে, এছাড়া তিনি অনেকগুলি নতুন পালাও আবিষ্কার করেছেন। সম্পাদনার জন্য রচিত তাঁর নিবন্ধগুলিও গীতিকার স্বরূপকে বুঝতে সাহায্য করে।

৮.১৪ চট্টগ্রাম রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য

মধ্যযুগে বিশুদ্ধ মানববিষয়ক কাব্যের অবতারণা প্রধানত করেছিলেন চট্টগ্রাম রোসাঙের মুসলমান কবিরা। মনব-মানবীর প্রেমবিরহ মিলনের যে রোমান্টিক চেতনা তাঁদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য তা তাঁর আয়ত্ত করেছিলেন আরবী-ফারসী ভাষার প্রণয় কথার মাধ্যমে। চট্টগ্রামের কবিরা যে সমস্ত হিন্দীকাব্য থেকে তাঁদের কাব্যরচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তাদেরও উৎস আরবী-ফারসী ভাষার কাব্য।

বৃহত্তর বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে চাটিগাঁ রোসাঙের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই অঞ্চল তখন আরাকানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরাকান পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ। আরাকানীরা বর্মী হলেও আরাকান রাজসভায় প্রথম থেকেই বর্মী ও বাঙালি সংস্কৃতির সম্মেলনের এক সহজ পরিবেশ প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছিল। আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা ধর্মসূত্রে যেমন পালি প্রাকৃতভাষার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলনে, তেমনি তাঁদের রাজসভাসদ ও প্রজাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। অতএব রোসাঙ রাজসভাতে একাধারে আর্যভারতীয় এবং মুসলমানী সংস্কৃতির চর্চা সুপ্রচলিত ছিল। কবি দৌলত কাজীর বর্মনায় আছে যে রোসাঙ রাজসভায় বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু সেই বৈচিত্র্য-বিভিন্নতার মধ্যেও বাংলাই ছিল রোসাঙের দেশি ভাষা সাহিত্য। এর ফলে ঐ অঞ্চলের গড়ে ওঠা সাহিত্য বিচিত্র ভাব ও সংস্কৃতির চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করলেও তা হল বাংলা সাহিত্য।

● দৌলৎ কাজি

দৌলৎ কাজি একখানি মাত্র কাব্যরচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটিকেও তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তবুও তিনিই চট্টগ্রাম রোসাঙের শ্রেষ্ঠ কবি। রোসাৎ শহরে বসে কাব্য লেখার সময় কবি রোসাঙের অবস্থান নির্দেশ করেছেন—

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসান্দ-নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।

কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খবরও কবি দিয়েছেন। 'রোসাঙরাজ শ্রীসুধা'র "ধর্মপাত্র" ছিলেন আশরফ খার এঁরই নির্দেশে কবি দৌলৎ তাঁর কাব্য রচনান্ত করেছিলেন। তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। আশরফখান গোছারী ঠেট ভাষা ছেড়ে সহজবোধ্য ভাষায় কবিকে কাব্যরচনার নির্দেশ দেন। কবি সাধন রচিত "মৈনা সত" কাব্যের অনুসরণেই কবি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছেন। কিন্তু দৌলতের কাব্য হুবহু অনুসৃতি নয়। সাধনের কাব্যকাঠামোকে আশ্রয় করে দৌলৎ কাজির কবিমানস ভাব-কল্পনার সৌন্দর্যলোকে অবাধ সঞ্চরণ করেছে।

দৌলত কাজির কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। রাজপুত্র লোরকের সঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী ময়নামতীর বিবাহ হয়েছিল। একদিন লোরকের অরণ্যবিহারের ইচ্ছা হল। তিনি রানী ময়না ওবং বৃদ্ধ পাত্রদের ওপর

রাজ্যভার দিয়ে বলে গেলেন। সেখানে এক যোগীর কাছে অপূর্ব রূপবতী গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীর প্রতিষ্ঠিত দেখে লোর মুগ্ধ হলেন। চন্দ্রানীর স্বামী মহাবীর বামন গোহারী রাজ্যকে শত্রুর সর্বশঙ্কামুক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল ব্যর্থ। এদিকে লোর তো চন্দ্রানীর সন্ধানে গোহারি রাজ্যে এলেন এবং বামনের অনুপস্থিতির সুযোগে চন্দ্রানীর সঙ্গে তাঁর গোপনে মিলন হল। কিন্তু ইত্যবসরে বামন ফিরে এলে তাঁরা দু'জন পালিয়ে গেলেন। কিন্তু গভীর বনে বামন গিয়ে তাঁদের পলায়নে বাধা দিলে লোরের সঙ্গে চন্দ্রানীও সাপের কামড়ে মারা গেল। কিন্তু এক ঋষি এসে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন গোহারি রাজও লোরের সঙ্গে শত্রুতা না রেখে সাদরে গ্রহণ করলেন।

এদিকে স্বামীবিরহিনী সতী ময়নামতীকে ছাতনকুমার নামক এক রাজপুত্র কামনা করল। দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করল রতনা মালিনীকে। ময়নামতীর বিরহবেদনার মুহূর্তে ইমালিনী তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চাইল, কিন্তু সতীত্ব ও দৃঢ় মনোবলে ময়নামতী তা উপেক্ষা করলেন। অবশেষে বারোমাসের শেষে সতী ময়না তাঁকে বিদায় করেন শান্তি দিয়ে। কিন্তু ময়নামতীর এই 'বারমাস্যা' দৌলত কাজী শেষ করে যেতে পারেননি। জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বর্ণনার আরম্ভেভই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপর কাব্য শেষ করেছেন পরবর্তী কবি আলাওল। আলাওলের কাব্যে দেখা যায় ময়নামতী রাজা লোরের কাছে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূতরূপে পাঠালেন। ইতিমধ্যে লোর চন্দ্রানীর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। লোর গোহারি রাজ্যের ভার চন্দ্রানীকে দিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে লোরের মৃত্যু হলে দুই রানীই সহমৃতা হল।

দৌলৎ কাজীর রচনাংশের তুলনায় আলাওলের কবি ধর্ম,—অন্তত সতী ময়নামতী কাব্যে অনেক নিষ্প্রভ। আলাওলের সব রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদে তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য। দৌলৎ কাজিও পণ্ডিত ছিলেন। এদিকে মুসলিম ও সুফী ধর্মশাস্ত্রে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান ও ভক্তি আর অন্যদিকে বেদ-পুরাণ-জয়দেব-বিদ্যাপতি, এমনকি কালিদাসের কাব্যকেও তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। কিন্তু দৌলৎ কাজির পাণ্ডিত্য কোথাও ভার হয়ে যায়নি। বরং তাঁর রচনা সরল, প্রাঞ্জল ও সরস।

তাঁর কাব্যে চরিত্রগুলিও প্রায় স্বাভাবিকরূপেই চিত্রিত হয়েছে। ময়নামতী ও চন্দ্রানী চরিত্র নারীস্বরূপের দুটি দিককে প্রকাশ করেছে। একদিকে আদর্শবাদ আর অন্যদিকে জীবনবাদ। ময়নামতী আদর্শবাদের কাছে—শাস্ত্রনীতির ও সমাজরীতির কাছে জীবনকে বলি দেয়। আর একজন জীবন ভোগের নামে আদর্শকে পদদলিত করে। আদর্শবাদ ও ভোগবাদ, সংযম ও স্বৈরাচার, সতীত্ব নারীত্ব, মর্যাদা ও লালসা, ত্যাগ ও ভোগ, লোভ ও ক্ষান্ত প্রভৃতির দ্বন্দ্বই কবি এই চরিত্র দুটিতে সুনিপুণভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

এছাড়াও উপমা, রূপক, উৎপেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের ও সুভাষিত বুলির প্রয়োগে ও বহুলতায় মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজী দৌলতের বিরল ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় মেলে। রোসঙ্গরাজের প্রশস্তি উপলক্ষ্যে তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসনের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি হিন্দুপুরাণ থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন—

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতল না যায় তারে ঠেলি॥
* * * *
সীতা সম সুন্দরী যদি রহে সে বনে।
রাজভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে॥

আবার মহম্মদ প্রশস্তিতে তাঁর অপার শক্তিদ্যোতকে উপমাপ্রয়োগও ভাষায় ও ভাবে কিছুটা অভিনব—

অঙ্গুল-ইঙ্গিত শরে শশী দুই খণ্ড বারে
প্রলয়-সমান তান দাষা॥
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জ্বলে নিতি
না নিবায়ে বায়ু-বৃষ্টি-জলে॥

দৌলত কাজির সুভাষিতাবলীর প্রাচুর্য তাঁর সমাজ অভিজ্ঞতা ও মননের উৎকর্ষ আর অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কবিপ্রতিভার সাম্যের পরিচয় বহন করে।

● **আলাওল**

দৌলৎ কাজির পরেই রোসাঙ রাজসভার দ্বিতীয় কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল। আলাওল প্রতিভা বিচিত্র কাব্যরচনায় সব সময়েই ব্যাপৃত। কিন্তু কবির নিজের জীবনও কম চিত্তাকর্ষক নয়। 'মুল্লুক ফতেহাবাদের জামালপুর গ্রামে কবির আদিনিবাস ছিল। কারও কারও মতে এই ফতেহাবাদ চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ফতেহাবাদ অর্থে প্রাচীন ফরিদপুরকেই বোঝায়। কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মান ও ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। আলাওলের পিতা নবাব কুতবের সভাসদ ছিলেন। একবার নৌকাযাত্রার সময় আলাওল ও তাঁর পিতা পর্তুগীত জলদস্যুদের হাতে পড়েন। আলাওলের পিতা জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। আলাওল বহু দুঃখ ভোগ করে রোসাঙে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি প্রথমে অশ্বারোহী রাজসৈনিকের কাজগ্রহণ করেন। রোসাঙ্গের প্রধান অমাত্য মগন ঠাকুর কবির প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কবির বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' রচিত হয়। এরপর কিছুকাল তাঁকে আরাকানের কারাগৃহে বিনা দোষে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল। তবে অল্পদিনের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আনুকূল্যে তিনি তাঁর পূর্বগৌরব ফিরে পান। মগন ঠাকুর ছাড়াও অর্থমন্ত্রী সুলেমান, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সৈয়দ মুসা ও আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুবর্মার নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাব্য অনুবাদ করেন।

মুসলমান সমাজে আলাওলের জনপ্রিয়তার কারণ হল তিনি ইসলামী কাহিনী ও ধর্মতত্ত্বের নানা গ্রন্থ মূল আরবী ও ফারসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—(১) সয়ফুলমুলুক বদি উজ্জমাল (১৬৫৮-৭০), (২) সপ্ত (হপ্ত) পয়কর (১৬৬০), (৩) তোহফা (১৬৬৩-৬৯), (৪) সেকান্দার নামা (১৬৭২) এগুলি সমস্তই ইসলামী বিষয় অবলম্বনে মুসলিম সমাজের জন্য লেখা—তাই এই কাব্যগুলি হিন্দুসমাজে আদৌ প্রচার করায়নি।

কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ অনুবাদকাব্য 'পদ্মাবতী' হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এটি মালিক মুহম্মদ জায়গীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। এই পদুমাবত কাব্যটি ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কবি রচনা করতে আরম্ভভ করেন। এটি সূফী সাধনতত্ত্বের রূপক। রূপককাব্যের কাহিনী হল রাজপুতানায় বহুল প্রচলিত। একটি লোকগাথা, রত্নসেন-পদ্মিনী দেওপাল ও পদ্মিনী সংক্রান্ত কাহিনী এতে বর্ণিত। জায়গীর কাব্যে উত্তর-ভারতীয় উপভাষার একটা সহজ লালিত্য ও মাধুর্য আছে। এছাড়াও ভাবুকের কাছে এটি জীবাত্মা-পরমাত্মাবিষয়ক তত্ত্বের আকর।

এই কাব্যে চিতোর অর্থে মানবদেহকে বোঝায়, রত্নসেন অর্থে জীবাত্মা, আবার পদ্মিনী হচ্ছেন বিবেক, শুকপাখি ধর্মগুরুর প্রতীক।

আলাওল এই অধ্যাত্মরূপকটিকে তাঁর কাব্যে চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। কবি প্রেম ও বিরহের যে বর্ণনা দিয়েছেন,তা দৃশ্যত লৌকিক হলেও প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্ম রসব্যঞ্জক। পদ্মিনীর রূপ বর্ণনাতে কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসরণ করেছেন। এছাড়াও কবি তাঁর এই কাব্যে হিন্দু অলঙ্কার, পিঙ্গলাচার্যের অষ্টমহাগণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিষয়েও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার রাজসভার ঐশ্বর্য। ঘোড়া ও হাতীর নানা ধরনের খেলা ও কবির কাব্যে স্থান পেয়েছে। এসমস্ত কিছুই কবির কাব্যে এক উদার

ধর্মনিরপেক্ষতার সৃষ্টি করেছে। কবির সুভাষিতবলী ও প্রবাদবাক্য রচনা ও তার বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ করে—

(১) পরশী হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।
নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাই ঠাঁই।
(২) তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়
ছেদিলে শতেক বার দুইখণ্ড নয়॥

পদ্মিনী রূপ বর্ণনায় কবি রোমান্টিক আবেগও সৃষ্টি করতে পেরেছেন—

সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি।
পদ-পরশন হেতু করায় লহরী।

পদ্মাবতীর তুলনায় আলাওলের অন্যান্য কাব্য দুর্বলতার মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কবি সৈফুল মুলুক বদি উজ্জমান রচনা করেন ১৬৫৮-৬০ খ্রিষ্টাব্দ। এটি ইসলামী রোমান্টিক প্রেম শহিল অবলম্বনে লেখা।

'হপ্ত পয়কর' ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। এঁতে আরবের রাজকুমার বাহরামেক যুদ্ধ জয় ও সপ্ত পত্নীর গল্প বর্ণিত হয়েছে। এর কাহিনীও কবির নিজস্ব নয়। ইরানি কবি নেজামি সমরকন্দের ফারসী ভাষায় লেখা আখ্যানই কবির মূল অবলম্বন। তোহফা ইসলামী শাত্রসংহিতার উপদেশে পূর্ণ নীতি গ্রন্থ। এটি ১৬৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। আলাওলের সর্বশেষ কাব্যের নাম সেকান্দার নামা। এটি নেজামি সমরকন্দীর ফারসী কাব্য 'ইসকান্দারনামার' সরল অনুবাদ। এর উপজীব্য আলোকজাণ্ডারের বিজয়কাহিনী।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন অল্পখ্যাত কবি হলেন 'চন্দ্রাবতী' রচয়িতা মাগন ঠাকুর, ইউসুফ জুলেখা রচয়িতা আবদুল হাকিম গুলের কাওলী রচয়িতা নওয়া জিস খান, মুক্তালহোসেন রচয়িতা মোহাম্মদ খান প্রভৃতি।

এছাড়াও সৈয়দ সুলতান রচনা করেছিলেন নবিবংশ, মুহম্মদ খান রচনা করেছিলেন 'সত্যকলিবিবাদ সংবাদ'।

পদুমাবৎ এর কাহিনী—কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম। চিতোরের রাজা ছিলেন রত্নসেন তাঁরপত্নীর নাম নাগমতী। সিংহল রাজ-দুহিতা পদ্মাবতীর রূপ গুণের খ্যাতি শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং সুশিক্ষিত শুক পাখি নিয়ে। সিংহল যাত্রা করেন। শুকের সাহায্যে রত্নসেন পদ্মিনীকে লাভ করেন। দুই পত্নী নিয়ে তাঁর সুখে দিন কাটতে থাকে। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি শুনে তাঁকে পাওয়ার জন্য চিতোর আক্রমণ করে ও রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী ফিরে যায়। রত্নসেন সুকৌশলে পালিয়ে আসেন। এদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মিনীকে বিপথগামী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রত্নসেন ফিরে এসে তাকে মেরে ফেলেন এবং নিজেও আহত হয়ে মারা যান। পদ্মাবতী ও নাগবতী অশুমৃতা হন। আলাউদ্দিন আবার চিতোর আক্রমণ করতে এসে সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রমাণ করে ফিরে যান।

৮.১৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে?

২। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট ধর্মমঙ্গাল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে, আলোচনা করুন।

৩। চৈতন্য পরবর্তী যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যকারের কবিকৃতির পরিচয় দিন। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তাঁদের কাব্যে কিভাবে উঠে এসেছে?

৪। চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের বিবরণ দিন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়কার পদাবলির গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৫। মধ্যযুগ রচিত যে কোনো চারটি চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের বিশেষত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৬। আরাকান রাজসভার সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার যে কোনো দু'জন বিশিষ্ট কবির পরিচয় দিন।

৭। চৈতন্য পরবর্তী অনুবাদ সাহিত্যের বিশিষ্টতা আলোচনা করুন। যে কোনো দুটি ধারার দু'জন কবির রচনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৮। কালিকামঙ্গালের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করুন। মঙ্গালকাব্যের বিশষত্ব এই কাব্যগুলির মধ্যে কতটা আছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। রামপ্রসাদ সেনের কালিকামঙ্গাল

২। যে কোনো দুটি বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন সম্পর্কে আলোচনা—গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত চিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু।

৩। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের বিশেষত্ব কী?

৪। শঙ্কর কবিচন্দ্র কোন্ সময়ের কবি? তাঁর ভাগবত অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড)/সুকুমার সেন, ১৪০১

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৬

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/প্রথম পর্যায়/ভূদেব চৌধুরী, ১৯৯৫

৪. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা/প্রথম খণ্ড/শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা/প্রথম খণ্ড/গোপাল হালদার, ১৯৫৭

৬. বাংলা মঙ্গাল কাব্যের ইতিহাস/আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৩৬

৭. ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলি সাহিত্য/বিমানবিহারী মজুমদার

৮. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস/ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৯৯২

৯. সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য/জনার্দন চক্রবর্তী

১০. বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১. বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য/আহমদ শরীফ/বাংলা একাডেমী ঢাকা/১৯৮৩

১২. বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ/সত্যবতী গিরি, ১৯৮৬

১৩. মৈমনসিংহ-গীতিকা : পুনর্বিচার/মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, ২০০৩

১৪. বাংলা নাথ সাহিত্য/সুখময় মুখোপাধ্যায়

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.